মহামানব

জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথ প্রণেতা

শ্রীশৈলেশ বসু

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
., শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
১৩৫৫—শ্রাবণ

ব্লক নির্ম্মাণ ও মুদ্রণ
গয়া আর্ট প্রেস

প্রকাশক :—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সিংহ কর্ত্তৃক
২৮, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

[প্রকাশ কর্ত্তৃক সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত]

মুদ্রাকর :—শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	উপক্রমণিকা	৵০
২।	গান্ধীজি—বাল্যে	১
৩।	গান্ধীজি—কৈশোরে	১১
৪।	গান্ধীজি—যৌবনে	২৩
৫।	সত্যাগ্রহ আন্দোলন—দক্ষিণ আফ্রিকায়	৩৭
৬।	সত্যাগ্রহ আন্দোলন—ভারতে	৮৭
৭।	গান্ধীজির অহিংসা	১৫০
৮।	হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য-প্রচেষ্টা	১৩১
৯।	উপসংহার	
	পরিশিষ্ট (ক)	১৪৭
১০।	মহামানবের মহাপ্রয়াণ	১৭৭
১১।	(খ) মহাত্মাজীর প্রতি নেতাজী	১৮০
১২।	(গ) দেশবিদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলী	১৮২
১৩।	(ঘ) মহামানবের মহাবাণী	১৮৫
১৪।	(ঙ) জীবন ও বাণী	১৮৬

চিত্রসূচী

১। পিতা করমচাঁদ গান্ধী .. .... ।/০

২। গান্ধীজির ভগ্নী গোপিবেন . ... ,,

৩। গান্ধীজির জন্মস্থান ... . ,,

৪। হরিলাল গান্ধী .... ।৵০

৫। মনিলাল গান্ধী ... . ,,

৬। মহাত্মা গান্ধী ... . ,,

৭। কস্তুরী বাঈ ... ... ,,

৮। রামদাস গান্ধী ... ... ,,

৯। দেবদাস গান্ধী ... ... ,,

১০। বাল্যে-মহাত্মা গান্ধী ৭

১১। বিলাতে অধ্যয়ন কালে মহাত্মা গান্ধী ... ৩২

১২। বুয়র যুদ্ধে মহাত্মাজী ৬৫

১৩। বুয়র যুদ্ধের সময় অ্যাম্বুলেন্স্ বাহিনীর অধিনায়করূপে গান্ধীজী ৬৬

১৪। টলষ্টয় ফার্মের প্রথম অধিবাসীদল .. ৬৭

১৫। দক্ষিণ আফ্রিকা ডেপুটেসনে গান্ধীজি ... ৭২

১৬। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির ও কস্তুবাঈ ৭৪

১৭। শান্তিনিকেতনের প্রতি গান্ধীজির প্রশংসায় রবীন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন (১৯১৪) ... ৭৪

১৮। ১৯১৩ সালে ট্রান্সভাল অভিমুখে সত্যাগ্রহীদল ... ৭৫

১৯। ১৯১৩ সালে সত্যাগ্রহ উপলক্ষে গান্ধীজি গ্রেপ্তার … ৭৫
২০। ১৯১৩ সালে আফ্রিকায় মিঃ ক্যালেনবাকও
মিসেস্ পোলকসহ গান্ধীজি ৮২
২১। ১৯১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় টলষ্টয় ফারমে মহাত্মা ৮৫
২২। চম্পারণ-সত্যাগ্রহে মহাত্মা .. ৮৯
২৩। মহাত্মার রাষ্ট্রগুরু গোখেল … ৯৭
২৪। কস্তুরীবাই গান্ধী … ১১২
২৫। মহম্মদ আলি ও সওকৎ আলি … ১১৩
২৬। লবণ সত্যাগ্রহী মেদিনীপুরবাসীদের উদ্দেশ্যে গান্ধীজির
উৎসাহপূর্ণ বাণী ১৩৪
২৭। গান্ধীজি ও সীমান্তগান্ধী আব্দুল গফুরখাঁ … ১৩৬
২৮। বল্লভাই প্যাটেল … ১৩৭
২৯। সেবা গ্রামে মহাত্মা গান্ধী … ১৩৮
৩০। ডাণ্ডি অভিযানের পূর্ব্বে মহাত্মাজী বড় লাটকে ঐতিহাসিক
পত্র লিখিতেছেন ১৪৫
৩১। বোম্বেতে মহাত্মাজি ও পণ্ডিত জহরলাল … ১৪৬
৩২। প্রফেসার নির্ম্মল বসু ও শ্রীযুক্ত শঙ্কররাওদেও রামগঞ্জ
থানার মানচিত্র লইয়া গ্রামান্তর ভ্রমণ সম্পর্কীয় বিষয়ে আলোচনা
করিতেছেন। ১৬৭
৩৩। গান্ধীজি সুপারী গাছের তৈয়ারী একটি সেতু অতিক্রম
করিতেছেন ১৬৮
৩৪। মহাত্মাজী আমেরিকান মহিলা সংবাদিকের সহিত কথোপকথন
রত ১৭০
৩৫। মহাপ্রয়াণে মহাত্মাজী … ১৭৩

৩৬। মহাত্মা গান্ধীর ভস্ম বহন ... ১৭৮

৩৭। ত্রিবেণী সঙ্গমে গান্ধীজির ভস্মবহণকারী নৌকা ১৭৯

৩৮। মহাত্মার সহিত নেতাজী ... ১৮১

৩৯। রোমাঁরোলাঁ ও মহাত্মাজী ... ১৮২

৪০। ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ মহাত্মাজীকে মটর গাড়ীতে উঠাইয়া দিতেছেন ১৮৪

৪১। মহাত্মাজি ও মহাদেব দেশাই .. ১৮৬

মহামানব

উপক্রমণিকা

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী।

হিংসা আকাশের মেঘে, হিংসা বাতাসের বেগে।

বিশ্বসৃষ্টির মূলে আছে ইলেক্‌ট্রণ-প্রোটন্ অণু-পরমাণুর প্রচণ্ড হিংসা। দুটী নক্ষত্রের প্রচণ্ডতর আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে জন্মালো সৌরজগৎ। জন্মালো আমাদের পৃথিবী।

হিংসা-জাত বিশ্বপ্রকৃতি প্রাণের প্রতি নিষ্করুণ। কোথাও প্রচণ্ড উষ্ণতা, কোথাও প্রচণ্ডশৈত্য।

এই হিংস্র নিষ্করুণ পৃথিবীর বুকে বিধাতার অমোঘ বিধানে জন্মালো একটী ক্ষুদ্র প্রাণের কণিকা। নাম তার অ্যামিবা। প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে সে বেঁচে রইলো। শুধু বেঁচে রইলো না, কালের যাত্রায় বিবর্ত্তনের ফলে সেই অ্যামিবা থেকে পৃথিবীর বুকে এল নানা কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষী।

প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য হিংস্র জন্তুদের জীবন-সংগ্রামে মুখর হ'য়ে উঠল।

তারপর এল মানুষ। দেহ তার ক্ষীণ, কিন্তু চোখে তার বিশ্বজয়ের স্বপ্ন, অন্তরে সুন্দরতর জীবনের কামনা। কিন্তু তার চারপাশে রয়েছে লোলুপ হিংস্র প্রাণীর দল—বিরাট ম্যামথ, খাঁড়া-দেঁতো বাঘ। তাই বেঁচে থাক্‌বার জন্যে সে আবিষ্কার করলো নানা অস্ত্র শস্ত্র। সেই অস্ত্র নিয়ে শিকারী মানুষ শিকারে উন্মত্ত হ'য়ে উঠলো।

মানুষ কি পশু হ'য়ে গেল? না, কারণ তার অন্তরে আছে অহিংসার একটী ক্ষীণ শিখা।

সেই শিখা দেদীপ্যমান হ'য়ে উঠলো বুদ্ধের বাণীতে, যীশুর মরণে, গান্ধীজির জীবনে।

কিন্তু হায়রে মানুষ! হায়রে তার পাশবিক দিগন্ত!

বুদ্ধের অহিংসার বাণী পরিণত হ'ল হাস্যকর লোকাচারে।

খৃষ্টের মৈত্রী-করুণার বাণী লুপ্ত হ'ল ট্যাঙ্ক-সাবমেরিন-বোমারু-বিমানের বিধ্বংসী অভিযানে।

তারপর এলেন গান্ধীজি। ভারতবর্ষের তখন বড় দুর্দ্দিন। হৃত-গৌরব ভারতবাসী তখন অন্ধকারে হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছে শুধু তার লুপ্ত স্বাধীনতার জন্যে নয়, তার হারানো আত্মার জন্যে।

গান্ধীজি এসে উদাত্তকণ্ঠে ডাক দিলেন, 'হে ভারতবাসী, তোমরা ভুলো না, তোমবা অমৃতের পুত্র। ওঠো, জাগো, আবার আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ কবো। তোমরা নির্ভীকভাবে মৃত্যুভয় তুচ্ছ ক'রে অন্যায়েব প্রতিরোধ করবে—হিংসা দিয়ে নয়, অস্ত্র দিয়ে নয়, প্রেমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা।....ভারতের ভাগ্য-বিধাতা নারায়নী সেনা নয়, নারায়ণ, দেহের শক্তি নয়, আত্মার শক্তি।...বুদ্ধ এবং খৃষ্ট জীবনের মধ্যে কিসের সুন্দরতম সমন্বয় দেখেছিলেন? শক্তির ও স্নেহের। তেমনি আমাদের সংগ্রামের পেছনেও থাকবে অপার করুণা।...অহিংসা আততায়ীর কাছে সদয় আনুগত্য নয়। অহিংসার অর্থ হ'ল আত্মার সমস্ত শক্তি দিয়ে অত্যাচারীর ইচ্ছার প্রতিরোধ করা। এমনিভাবেই একটী মাত্র মানুষও একটী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, তার পতন ঘটাতে পারে।'

একটী মানুষ, কিন্তু তাঁর দুরন্ত আত্মবলে চল্লিশ কোটি ভারতবাসীকে স্বাধীনতার আস্বাদ দিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন।

কিন্তু গান্ধীজির অবর্ত্তমানে এখন আমরা কি করবো? কোন পথে যাব?

মানুষ চিরকাল মহামানবদের ভয় ক'রে এসেছে। তাই তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বাণী লোক চক্ষুর অন্তরালে মন্দিরের মধ্যে বন্দী ক'রে রেখেছে। আমরাও কি তাই করবো?

আমরা কোনপথে যাবো? হিংসার আপাত-সহজ নিশ্চিত ধ্বংসের পথে? না, অহিংসার দুর্গম মুক্তিময় চিরশান্তির পথে?

গান্ধীজির মৃত্যুর পটভূমিকায় ভারতবাসী আজ এই প্রশ্নের উত্তর চাইছে।

ভারতের অবিনশ্বর আত্মার সামনে আজ মহাপরীক্ষার দিন!

———

পিতা করমচাঁদ গান্ধী

গান্ধীজির ভগ্নী শ্রীমতি গোকিবেন

গান্ধীজির জন্মস্থান

১। হরিলাল গান্ধী, ২। মনিলাল গান্ধী, ৩। মহাত্মা গান্ধী,
৪। কস্তুরীবাঈ, ৫। রামদাস গান্ধী, ৬। দেবদাস গান্ধী

গান্ধীজি—বাল্যে

আরব সাগর যেখানে উচ্ছল-তরঙ্গে ভারতবর্ষের ম্যাপের বুড়ো আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে, সেইখানে কাথিয়াবাড রাজ্য-মণ্ডলীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্থান। বুড়োআঙুলের নখের কাছে কাথিয়াবাড় রাজ্যের প্রধান নগরী পোরবন্দর।

গান্ধী-পরিবার এই পোরবন্দরের একটী নামী বংশ।

গান্ধী-পরিবার জাতে ছিলেন বেনে, বৈশ্য, কিন্তু গুনে ছিলেন ক্ষত্রিয়!

এই বংশের উত্তমচাঁদ গান্ধী একজন সত্যিকারের পুরুষসিংহ। প্রথম জীবনে তিনি নিতান্তই গরীব ছিলেন, কাথিয়াবাড় রাজ সরকারের দপ্তরে সামান্য বেতনে কাজ করতেন। তারপর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ কর্ম্ম-পটুতা এবং নির্ভীক সততার গুণে উন্নতির এক এক সোপান পার হ'য়ে শেষ পর্য্যন্ত কাথিয়াবাড় রাজ্যের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত

হন। কিন্তু দেওয়ান হ'য়েও ক্ষমতা-প্রিয়তা বা অর্থলোভ একবারের জন্যেও তাঁর মনে মোহজাল বিস্তার করতে পারেনি। তাঁর নির্ভীক সত্যনিষ্ঠার কাহিনী শুনলে গল্প ব'লে মনে হয়। একবার তখন পোরবন্দরের রাণার মৃত্যু হয়েছে। নাবালক পুত্রের প্রতিনিধিরূপে রাজমাতা রূপালিবা রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন। হঠাৎ ক্ষমতা হাতে পেয়ে তিনি স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে উঠলেন।

একদিন বিনাদোষে একজন রাজ-ভাণ্ডারী তাঁর বিরাগ-ভাজন হ'ল। বিপদ আসন্ন দেখে রাজ-ভাণ্ডারী অবিলম্বে উত্তমচাঁদের কাছে এসে আশ্রয় ভিক্ষা করলো। উত্তমচাঁদ জানতেন ভাণ্ডারীর কোন দোষ নেই। তাই রাজরোষের ভয় থাকলেও তাকে অভয় দিয়ে নিজগৃহে লুকিয়ে রাখলেন।

কথাটা কিন্তু রাণীর কানে পোঁছতে দেরী হ'ল না। তিনি উত্তমচাঁদকে ডেকে বললেন, 'উত্তমচাঁদ' ভাণ্ডারীকে শীগ্‌গির কোতোয়ালের হাতে সমর্পণ করো। আমার আদেশ।' উত্তমচাঁদ বিনীতভাবে বল্লেন, 'মহারাণী' 'আমি এ আদেশ পালনে অক্ষম।'

'অক্ষম!' রাণী ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, 'জানো' তোমায় আমি কঠোর শাস্তি দিতে পারি।'

উত্তমচাঁদ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন, 'জানি, কিন্তু শরণাগতকে আশ্রয় দান হিন্দুর ধর্ম্ম। এ অন্যায় আদেশ করবেন না, তার বদলে আমি যে কোন শাস্তি নিতে রাজী আছি।'

ক্ষমতান্ধ রাণী কিন্তু উত্তমচাঁদের এই অপরূপ সত্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হলেন না। তিনি উত্তমচাঁদকে বন্দী করবার জন্যে সৈন্য পাঠালেন।

উত্তমচাঁদ কিন্তু আগেই সে খবর পেয়ে পার্শ্ববর্ত্তী জুনাগড় রাজ্যে পালিয়ে গেলেন।

দেওয়ান উত্তমচাঁদের কার্য্য দক্ষতার কাহিনী আশপাশের সমস্ত রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং জুনাগড়ের নবাব তাঁকে ডেকে পাঠালেন।

দরবারে প্রবেশ ক'রে উত্তমচাঁদ বাঁ-হাতে নবাবকে অভিবাদন করলেন।

নবাব বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলেন, 'বাঁ-হাতে কেন উত্তমচাঁদ' ?

উত্তমচাঁদ ধীরস্বরে বল্লেন, 'জাঁহাপনা, ডান-হাত খানা আমার পোরবন্দরের সম্পত্তি, কিন্তু বাঁ-হাত আমার নিজস্ব। তাই শুধু-বাঁ-হাতেই আপনাকে অভিবাদন করবার অধিকার আছে।'

বিশ্বাস-ঘাতক প্রভুর প্রতি এতখানি ভক্তি যথেষ্ট বিস্ময়ের ই কি।

নবাবের চেষ্টায় তিনি আবার পোরবন্দরে ফিরে যান। কিন্তু এবারে তিনি নিজে আর দেওয়ানি গ্রহণ করলেন না। তার বদলে দেওয়ান হলেন তাঁর পঞ্চম পুত্র করমচাঁদ গান্ধী। তখন করমচাঁদের বয়স মাত্র পঁচিশ।

কিন্তু সেই তরুণ বয়েসেও জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্য নিপুণভাবেই চালাতে লাগ্‌লেন। তেজস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠায় তিনি পিতার যোগ্য পুত্র ছিলেন।

তিনি কিছুদিন রাজকোটের দেওয়ানগিরি করেছিলেন। সেই সময় ভেন্‌কেনের রাজা শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করবার জন্য করমচাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মাত্র পাঁচ বছরের জন্যে। করমচাঁদ ভন্‌কেনে যেতে রাজী হন, কিন্তু একটি সর্ত্তে। সেই সর্ত্তটা হ'ল, রাজা যদি কখনো তাঁর কোন কাজে হস্তক্ষেপ করেন, তবে তিনি পাঁচ বছর পূর্ণ না হলেও কাজ ছেড়ে দিতে পারবেন এবং পাঁচ বছরের পুরো বেতনে তাঁর অধিকার থাকবে।

কিন্তু ভেন্‌কেনে যাবার মাস কয়েক পরেই রাজার দিক থেকে চুক্তি ভঙ্গ হয়। করমচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে কাজ ছেড়ে রাজ-কোটে ফিরে গেলেন।

ভেন্‌কেনের রাজা চুক্তি অনুযায়ী পাঁচ-বছরের পুরো মাইনে তাঁকে দিতে চাইলেন, কিন্তু করমচাঁদ তা গ্রহণ করলেন না। আইনতঃ সে টাকা তাঁর প্রাপ্য হ'লেও, ধর্ম্মতঃ তাতে তাঁর কোন অধিকার নেই। তা ছাড়া অর্থের ওপর যখন লোভ নেই, তখন ধর্ম্মের চেয়ে আইনকে বড় ক'রে দেখবেন কেন?

আর একবার তাঁর সংঘর্ষ বেধেছিল একটি শ্বেতাঙ্গ নন্দনের সঙ্গে।

সেই শ্বেতাঙ্গটী ছিলেন রাজকোটের একজন সহকারী

পোলিটিক্যাল এজেন্ট্‌। করদ রাজ্যের এই ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্ট্‌গুলি নিজেদের এক-একটি ছোটখাট লাটসাহেব ব'লে ভাবেন। এই ধারণার বশেই বোধ হয় তিনি একদিন করমচাঁদের সামনে রাজকোটের রাজার সম্বন্ধে একটি অভদ্র টিপ্পনী কাটেন।

তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, শ্বেতাঙ্গের গালি শুনে কৃতার্থ হ'য়ে করমচাঁদ ভাবে গদগদ হ'য়ে পড়লেন। কিন্তু তার বদলে করমচাঁদ সাহেবের অভদ্রতা তীব্র সমালোচনা করলেন।

সাহেব ভয়ানক ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন। তাঁর সমালোচনা মানেই ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমালোচনা। এতখানি ধৃষ্টতা, সাহেব বল্লেন, ক্ষমা চাও।

করমচাঁদ ব্যঙ্গ ক'রে বল্লেন, কি রকম ? দোষ করলে তুমি আর ক্ষমা চাইব আমি ?

সাহেবের রাগ মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তিনি করমচাঁদকে বন্দী ক'রে একটা গাছের তলায় আট্‌কে রেখে বল্লেন, ক্ষমা না চাইলে ছাড়া পাবে না।

কিন্তু করমচাঁদের তেজ এতেও বিন্দুমাত্র দমিত হ'ল না। সাহেব তখন হতাশ হ'য়ে তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

এই হ'ল গান্ধী বংশের পরিচয়। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন নির্ভীক, শাসন দক্ষ, সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মভীরু ও দানশীল। বৈশ্যের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যেন একীকরণ।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর এই গান্ধী বংশে পোরবন্দর নগরে করমচাঁদ গান্ধীর একটি পুত্রের জন্ম হ'ল।

হয়ত তখন নীরবে ও গোপনে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল।

হয়ত তখন বিশ্বের আর্ত্তমানবের বক্ষস্পন্দন হঠাৎ দ্রুত হ'য়ে উঠেছিল।

হয়ত তখন ভারতমাতার চোখে আনন্দের অশ্রু উথ্‌লে পড়েছিল।

কারণ এ ত শুধু একটি শিশুর জন্ম নয়, এ যে একটী মহামানবের আত্মার প্রথম যাত্রারম্ভ।

কিম্বা হয়ত সবই স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছিল। যেমন স্বাভাবিকভাবে পুতলীবাই শিশুপুত্রটীকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। যেমন স্বাভাবিকভাবে বাবা-মা শিশুটীর নাম রাখ্‌লেন মোহনদাস।

মায়ের অতি-আদরে মোহনদাস মানুষ হ'তে লাগ্‌লেন শিশু মোহনদাসের চঞ্চল কলহাস্যে ও প্রাণবন্ত দুরন্তপনায় গৃহ মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌লো। মা পুতলীবাই হাসিমুখে শিশুর খেলা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

কিন্তু একবারের জন্যও তাঁর মনে হ'ল না, একদিন এই দুরন্তছেলেটী তার দুরন্ত আত্মবলে বিংশ শতাব্দীর বস্তুতন্ত্রের শক্ত বনিয়াদ প্রবলভাবে কাঁপিয়ে তুলবেন।

শৈশবের হাসিভরা দিনগুলি কিন্তু বেশীদিন রইলো

না। মোহনদাসের জীবনেও এল শৈশবের সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

বাল্যে—মহাত্মা গান্ধী

শেলেট আর বই হাতে নিয়ে মোহন দাসকে যেতে হ'ল ইস্কুলে। কিন্তু ইস্কুলে গেলেও পড়াশোনায় মন যাবে কেন? বিশেষ ক'রে নামৃতা মুখস্ত করা তাঁর কাছে বিষবৎ ছিল। ছ-সাত্‌তে কত হয় জিগেস্‌ করলেই তাঁর প্রায় কান্না এসে যেত। হাতের লেখা লিখ্‌তেও তাঁর ভাল লাগ্‌ত না। পড়াশোনা করার সঙ্গে হাতের লেখা ভাল হওয়ার কি সম্পর্ক, তাঁর মাথায় ঢুকত না। কিন্তু হাতের লেখা ভালো না হ'লেও ঐ হাত দিয়েই একদিন তিনি মহাকালের বুকে অমৃতময় বাণী লিখে রেখে যাবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোহনদাস ছাত্র হিসেবে মোটেই সুবিধের ছিলেন না। উপরন্তু অন্য ছেলেদের দেখাদেখি আড়ালে ছড়া কেটে শিক্ষক মহাশয়ের গালি দিতে শিখে-ছিলেন। তিনি অতি সাধারণ ছেলে ছিলেন মনে হয়? ঠিক

তা' নয়। কারণ আত্মচরিতে তিনি লিখে গেছেন, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে সতীর্থদের বা শিক্ষকদের কাছে আমি কখনো একটাও মিথ্যেকথা বলিছি ব'লে মনে পড়ে না।' শতকরা একজন ছেলেও জোর গলায় এ-কথা বলতে পারে না।

দিনের এই দুরন্ত ছেলেটি কিন্তু রাত্রি হ'লে একেবারে কাহিল হ'য়ে পড়তেন। ভূতের ভয়ে তিনি একঘর থেকে আর এক ঘরে যেতেও আতকে উঠতেন। ধাত্রী রম্ভাকে জড়িয়ে ধ'রে জড়সড় হ'য়ে চোখ বুঁজে প'ড়ে থাক্‌তেন।

রম্ভা বলে দিয়েছিল ; ভয় পেলেই রাম-রাম ধ্বনি করতে।

অন্ধকারে শুয়ে যেন মনে হ'ত ভূত প্রেতেরা চুপি চুপি কথা ক'য়ে বেড়াচ্ছে। আর শুধু কি ভূত? এক কোন থেকে আস্‌ছে ভূত, আর এক কোন থেকে সাপ, আর এক কোন থেকে চোর। আর বালক মোহনদাস প্রাণপণে রামনাম উচ্চারণ ক'রে চলেছেন।

ছেলেবেলায় যে রামনাম তিনি ভুতের বিরুদ্ধে অস্ত্র-স্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন, পরবর্ত্তী জীবনে সেই রামনাম মুখে নিয়েই তিনি নির্ভীকভাবে বিজ্ঞানের মারনাস্ত্রের সামনে এগিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন।

গান্ধী পরিবারের আর একটা বৈশিষ্ঠ ছিল ধর্ম্ম। তাঁরা রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাক্‌লেও ধর্ম্মের প্রতি কোনদিন অবহেলা দেখান্‌নি। এমন কি অন্যান্য রাজনীতিদের মত ধর্ম্মকে

ব্যবহারিক জীবনের স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে লজ্জিত হতেন। এই ধর্ম্মের আবহাওয়ার মধ্যেই গান্ধীজি মানুষ হয়েছিলেন।

গান্ধীজি বল্‌তেন, ছেলেবেলার কথা ভাব্‌তে গেলে আমার মায়ের সম্বন্ধে যে-কথা প্রথম মনে পড়ে, তা হচ্ছে তাঁর ধর্ম্মানুভবতা। ধর্ম্ম ছিল পুতলিবাইয়ের জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। তিনি সন্ধ্যাহ্নিক না সেরে কোনদিন জলগ্রহণ করতেন করতেন না। তিনি প্রত্যেকদিন বৈষ্ণব-মন্দির হাবেলীতে আরাধনা করতে যেতেন। তাঁর আঁচল ধ'রে সঙ্গে সঙ্গে যেতেন শিশু মোহনদাস। মোহনদাস কিন্তু মন্দির পছন্দ করতেন না। বোধ হয় অত অল্প বয়সেই নিজের অজ্ঞাতেই তিনি বুঝ্‌তে পেরেছিলেন, মন্দিরে বড় বেশী বাহ্যাড়ম্বর; মন্দির দাঁড়িয়ে আছে শুধু মানুষের দম্ভ আর তুর্নীতির সাক্ষী হ'য়ে।

গান্ধী-পরিবারে একজন জৈন সাধুরও যাতায়াত ছিল। মায়ের কোল ঘেঁসে ব'সে মোহনদাস তাঁব ধর্ম্মোপদেশ শুন্‌তেন বুদ্ধির চেয়ে প্রেমই মানুষকে ভগবানের নিকটতর করে। কিছু বুঝ্‌তেন না, শুধু বুঝ্‌তেন 'জীবে দয়া করে যেই, সেই সেবিছে ঈশ্বর।'

পুতলিবাই ধর্ম্মের জন্য প্রায় উপবাস করতেন। শারীরিক অসুস্থতাও তাঁর ব্রত পালনে বাধা ঘটাতে পারত না। প্রত্যেক বছর তিনি চাতুর্মাস্য পালন করবার সময় দিনের পর দিন একাহার কিংবা একদিন অন্তর আহার ক'রে কাটিয়ে দিতেন।

আর একবার ঠিক করলেন, সূর্য্যকে প্রণাম না ক'রে আহার করবেন না। তখন বর্ষাকাল। আকাশ প্রায়ই মেঘে ঢাকা থাকে। মোহনদাস আকাশের দিকে চেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তেন, কখন সূর্য্য ওঠে। সূর্য্য হয়ত মেঘের ফাঁক থেকে একটুখানি উকি মেরেছে, গান্ধীজি, চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, 'মা-মা, সূর্য্য উঠেছে।' ছেলের ডাকে মা বাইরে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু ততক্ষণ সূর্য্য আবার অন্তর্দ্ধান করেছে। পুতলিবাই হেসে বল্‌তেন, 'দেখলে ত, ভগবান চান না আমি আজকে আহার করি।'

এই রকম মায়ের চরিত্রের আলোকে গান্ধীজির শৈশব উজ্জ্বল হ'য়েছিল।

কিন্তু একটা জিনিষ বালক মোহনদাসের অত্যন্ত বিসদৃশ লাগ্‌ত। তাঁদের বাড়ীতে পাইখানা পরিষ্কার করবার জন্যে মেথর আসত্। মোহনদাস হয়ত তখন খেলা করছেন। মা সাবধান করে দিলেন, মোহনদাস, একপাশে দাঁড়া, ওকে ছুঁস্‌নি।

মোহনদাস প্রশ্ন করলেন, 'কেন মা, ছুঁলে কি হয়?'

'ছুঁলে চান করতে হয়।'

'কেন মা?'

'কারণ ওরা অস্পৃশ্য। ওদের ছুলে পাপ হয়।'

পাপ হয়! মানুষকে ছুঁলে পাপ হয়? মাকে বারবার প্রশ্ন করতেন, পাপ কেন হয়' মা তার কি উত্তর দেবেন, বল্‌তেন, শাস্ত্রের নিয়ম।

এই নিকরুন সমাজের নিষ্ঠুর অবিচারের দিকে অসহায় বালক আহত চোখে চেয়ে থাক্‌তেন। মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বড় হ'য়ে এই অস্পৃশ্যতার মূল তিনি ভারতের মাটি থেকে উপ্‌ড়ে ফেলে দিবেন।

গান্ধীজি—কৈশোরে

গান্ধীজির যখন বারো বছর বয়স, তখন তিনি রাজকোটের উচ্চ-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হলেন। তাঁর প্রকৃতি অত্যন্ত লাজুক ছিল। কারুর সঙ্গে তিনি মিশতে পারতেন না। ফলে পাঠ্যপুস্তকগুলি তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইস্কুলে হাজির হওয়া আর ছুটীর পরই দৌড়ে বাড়ী চ'লে আসা, এই ছিল তাঁর প্রত্যেক দিনের অভ্যেস। সত্যি-সত্যিই দৌড়তে-দৌড়তে বাড়ী ফিরতেন, পাছে কোন ছেলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে। তাঁর ভয় ছিল, ছেলেরা হয়ত তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করবে। কিন্তু কেন, তা নিজেও জানতেন না।

প্রথম বৎসরের পরিক্ষার সময় একটা ঘটনা ঘটল।

ইন্‌সপেক্টর ইস্কুল পরিদর্শনে এলেন। বানান পরীক্ষার পাঁচটা ইংরাজী শব্দ তিনি ছাত্রদের লিখ্‌তে দিলেন। তার ভেতর একটা কথা ছিল (kettle) গান্ধীজি সেটা ভুল লিখেছিলেন। শিক্ষকমহাশয়ের জুতোর অগ্রভাগ দিয়ে তাঁকে ইসারা করলেন। কিন্তু শিক্ষক মশায় যে তাঁকে পাশের ছেলের সেলেট থেকে টুক্‌তে বল্‌ছেন, এটা তাঁর মাথায় এল না, কারণ

তিনি জানতেন শিক্ষকের কাজ হ'ল ছেলেরা যাতে না টোকে তা' দেখা। ফলে একমাত্র মোহনদাসেরই বানানটী ভুল হ'ল

পরে শিক্ষকমশায় বলেছিলেন, 'মোহনদাস তুমি একটি আস্ত গাধা।'

এই ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে গান্ধীজি তাঁর আত্মচরিতে ব্যঙ্গমিশ্রিত বিনয়ের সঙ্গে লিখেছেন, সত্যি-সত্যিই আমি ভয়ানক বোকা, সারাজীবনেও নকল করবার বিদ্যেটা আয়ত্ত ক'রে উঠ্‌তে পারলুম না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, এই ঘটনার পরও তিনি শিক্ষকমশায়কে সমানভাবে শ্রদ্ধা ক'রে চলেছিলেন। তিনি ছেলেবেলা থেকেই শিখেছিলেন. গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে হয়। শত অপরাধ থাক্‌লেও গুরুজন, গুরুজন তাঁদের সমালোচনা করবার অধিকার আমাদের নেই।

এই সময়ের আর একটা ঘটনায় এই অসাধারণ ছেলেটার অসাধারণত্বের আর একটি নমুনা পাওয়া যায়।

পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের অভিনয় দেখ্‌তে যান। নাটকটা দেখে তিনি মুগ্ধ হন। বার-বার দেখেও তাঁর যেন তৃপ্তি হয় না। নাটকের কথা ও দৃশ্যগুলি সবসময় তাঁর মন আচ্ছন্ন ক'রে রইল। নির্জ্জনে তিনি নিজেই নাটকের অভিনয় করতেন। কিন্তু অন্য ছেলেরা যেমন শুধু নাটকের কাল্পনিক কাহিনীতেই মোহিত হয়, তিনি মোটেই তা হন্‌নি। নাটকটা দেখে তিনি ঠিক করেছিলেন, হরিশ্চন্দ্রের

মত সত্যের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ এবং দুর্ব্বদুঃখবরণই হবে তাঁর জীবনের আদর্শ। তিনি দিনরাত ভাবতেন; লোকে কেন হরিশ্চন্দ্রের মত একাগ্র সত্যপরায়ণ হয় না? একটি বারো বছরের ছেলে যে জনসমাজের মধ্যে সত্যের অভাব অনুভব করতে পেরেছিলেন, তা' যথেষ্ট বিস্ময়ের বই কি। বোধ হয়, তাঁর অন্তরবাসী তপস্যারত ঋষিই তাঁকে এ ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিতান্ত সাধারণ ছাত্র হ'লেও উচ্চ-বিদ্যালয়ে কিন্তু তিনি ভালছেলে ব'লে নাম কিন্‌লেন। প্রথম শ্রেণীতে চার টাকা এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে দশ টাকা স্কলারসিপ্ পর্য্যন্ত পেলেন। শিক্ষক মহাশয়রাও তাঁকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। গান্ধীজির প্রত্যেক বছর ইস্কুল থেকে সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন।

নিজের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে কিন্তু তাঁর বিশেষ উঁচু ধারণা ছিল না। তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল, চরিত্র বজায় রাখার দিকে— যা'তে এক ফোঁটা কালিমাও না তাঁর চরিত্রে লাগে। তাই শিক্ষক মশায় তিরস্কার করলে তাঁর চোখে জল আস্‌ত। এক-দিন কোন একটী অপরাধের জন্যে গান্ধীজি বেতপেটা খেলেন। শাস্তি পাওয়ার জন্যে তাঁর একটুও কষ্ট হ'ল না, কিন্তু তিনি যে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এই কথা ভেবেই তিনি কেঁদে ফেললেন। ইস্কুলের কটাছেলে দোষ ক'রে নিজেকে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ভাব্‌তে পারে?

তের বছর বয়সে গান্ধীজির বিয়ে হয়।

বিয়ের জন্যে একবছর তাঁর পড়াশোনা বন্ধ রইল। কিন্তু শিক্ষকমশায় তাঁকে এক ক্লাস ওপরে তুলে দিতে রাজী হলেন। ফলে ছ'মাস পরে কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে পড়ে তিনি গরমের ছুটিব পর পরের উচ্চশ্রেণীতে উঠ্‌লেন। ছ'মাস পরেই আবার তাঁকে পরীক্ষা দিতে হবে। একবছরেই তু'বছরের পড়া করতে গিয়ে তিনি হিমসিম খেয়ে গেলেন।

এই ক্লাস থেকেই ইংরাজীতে পড়ানো আরম্ভ হ'ল। তার ওপর আছে জ্যামিতি কিছুতেই জ্যামিতির সম্পাদ্য গুলো তাঁর মাথায় ঢুকত না। তিনি প্রাণপণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে মুখস্থ আরম্ভ করলেন। কিন্তু একদিন পড়তে পড়তে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, মুখস্থ ক'রে জ্যামিতিকে কায়দা করা যায় না, জামিতিকে পরাস্থ করবার সবচেয়ে সহজ অস্ত্র হচ্ছে বুদ্ধি। তার পর থেকেই জ্যামিতি তাঁর কাছে জলের মত সহজ হ'য়ে গেল।

জ্যামিতি সামলানো গেলেও বাধা হ'য়ে দাঁড়ালো সংস্কৃত। আর পাঁচজন ছেলের মত তাঁর কাছেও সংস্কৃত অত্যন্ত তুরূহ হ'ল। ব্যাকরণ মুখস্থ করতে গিয়ে তাঁর চোখে জল আস্‌ত। একে ত সংস্কৃতের জটিলতা, তার ওপর সংস্কৃত পণ্ডিতটীর পড়ানোও ছিল অত্যন্ত নীরস। সংস্কৃত ক্লাসে তিনি ছট্‌ফট্‌ করতেন।

এই সময় ছেলেদের মুখে শুনলেন, পার্শী ভাষাটা নাকি খুব সোজা। পার্শী মৌলভিটির ব্যবহার খুব ভাল ছিল।

ফলে গান্ধীজি সংস্কৃত ছেড়ে পার্শী শ্রেণীতে গিয়ে বস্‌লেন। তাঁর এই ব্যবহারে পণ্ডিত মশায় কিন্তু অত্যন্ত মর্ম্মাহত হ'লেন। তিনি মোহনদাসকে কাছে ডেকে বল্‌লেন, 'তুমি কি ভুলে গেলে তুমি বৈষ্ণব-পিতার সন্তান? তোমার শাস্ত্রের ভাষা তুমি শিখ্‌বে না? যদি শক্ত লাগে, আমার কাছে এলেই পার। আমি যথা সাধ্য চেষ্টা করে সহজ করে তোমায় বুঝিয়ে দেব'।

পণ্ডিত মশায়ের কথা শুনে গান্ধীজি অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তারপর থেকে মন দিয়ে সংস্কৃত পড়া আরম্ভ করলেন। কিন্তু ভাল ক'রে কোনদিন আয়ত্তে আন্‌তে পারলেন না।

গান্ধীজি বারবার বলেছেন, ভাল ক'রে সংস্কৃত ভাষা না শেখার জন্য আমি আজীবন লজ্জিত। অনেক শিক্ষিত ভারত-বাসীর মতই তিনিও প্রথম বেদ-উপনিষদ প'ড়েছিলেন ইংরাজী-অনুবাদে।

পড়াশুনায় যথেষ্ট মন থাক্‌লেও খেলা ধূলা করা কিন্তু গান্ধীজি মোটেই পছন্দ করতেন না। ব্যায়াম জিনিষটাকে তিনি চিরকাল এড়িয়ে চল্‌তেন। ইস্কুলে উচ্চ-শ্রেণীর ছেলেদের খেলা এবং ব্যায়াম অবশ্য করণীয় ছিল। গান্ধীজি নানা ছুতোয় এই নিয়মের হাত থেকে দূরে ছিলেন।

তাঁর ব্যায়াম-বিমুখতার একটি কারণ হয়ত তাঁর লাজুকতা। প্রকাশ্যে অন্যান্য ছেলেদের সামনে ব্যায়াম করতে তাঁর লজ্জা করত। আর একটা কারণ হ'ল, তাঁর ধারণা হয়েছিল যে শিক্ষার সঙ্গে জিমন্যাষ্টিকের কোন সম্পর্ক নেই।

ব্যায়াম না করলেও তাঁর স্বাস্থ্যের খুব ক্ষতি হয়নি। কারণ তিনি একখানা বইতে মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণের উপকারিতা পড়েছিলেন। সেই থেকে তিনি প্রত্যহ অনেক খানি ক'রে পথ হাঁট্তেন। এই ভ্রমণ করবার স্বভাব তাঁর জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ছিল। এই বেড়ানোর ফলেই তিনি অত্যন্ত কর্ম্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু হ'তে পেরেছিলেন।

আর পাঁচজন ছেলের মত গান্ধীজির চরিত্রেরও এই কিশোর-বয়সে দু'একটা দোষ ত্রুটি প্রবেশ করেছিল।

তিনি আর তাঁর এক আত্মীয় দু'জনে মিলে সিগারেট খেতে শিখেছিলেন। অবশ্য তার মূলে ছিল শিশু-সুলভ অনুকরণ-প্রিয়তা। সিগারেট খাওয়া ভাল কি মন্দ তাও কোনদিন ভাবেননি বা সিগারেটের গন্ধ যে তাঁর বিশেষ ভাল লাগত তাই নয়। তিনি দেখেছিলেন, তাঁর মামা সিগারেট খাচ্ছেন আর চমৎকার মজা ক'রে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছেন। এই ধোঁয়া ছাড়বার ম্যাজিক দেখবার লোভেই আসলে তিনি ধূমপান আরম্ভ করেছিলেন।

কিন্তু সিগারেট কেন্বার পয়সা কোথায়? সুতরাং মামার ফেলে-দেওয়া সিগারেটের টুক্রো দিয়েই তাঁর ধূমপান করার শিক্ষা-নবিশী আরম্ভ হ'ল। কিন্তু মুস্কিল হ'ল, এই টুক্রোগুলো একে সব সময় যোগাড় করা সম্ভব হ'ত না, তারওপর প্রাণপনে টান দিয়েও ও থেকে বিশেষ ধোঁয়া বার করা যেত না। ধোয়া বার করবার জন্যেই সিগারেট খাওয়া। তাই যদি না করা গেল

তবে সিগারেট খেয়ে লাভ কি? এদিকে সিগারেট-খাওয়া ছাড়াও যায় না। সুতরাং তিনি চাকরদের পকেট থেকে পয়সা চুরি আরম্ভ করলেন। সেই চুরি করা পয়সায় বিড়ি কিনে দুজনে মিলে সপ্তাকয়েক বেশ চালালেন। তারপর শুনলেন, এক ধরনের গাছের ডাঁটা দিয়ে সিগারেটের মত চমৎকার ধোঁয়া বার করা যায়। যেই শোনা অমনি পরীক্ষা আরম্ভ হ'য়ে গেল। কিন্তু এই সব নকল জিনিষে তাঁদের পরিতৃপ্তি হ'ল না। ছেলেবেলার স্বাধীনতার অভাব পদে পদে পীড়া দিতে লাগল। গুরুজনের অনুমতি ছাড়া যে কোন কাজ করবার উপায় নেই এটা তাঁদের অসহ্য মনে হ'ল। সুতরাং এই পরাধীনতায় বিরক্ত হ'য়ে ঠিক করলেন আত্মহত্যা করবেন।

কিন্তু অত্মহত্যা করবাব উপকরন পাওয়া যাবে কোত্থেকে? তাঁরা শুনেছিলেন ধুতরো বিচি নাকি বেশ বিষাক্ত। সুতরাং জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ধুতরো-বিচি সংগ্রহ করলেন। ঠিক হ'ল, সন্ধ্যেবেলা কেদারজী-মন্দিরে গিয়ে আত্মহত্যা করা হবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর সাহসে কুলোল না। গোটা দুয়েক বিচি মুখে পুরে ভাবলেন, 'কি হবে আত্মহত্যা ক'রে? কয়েকদিন স্বাধীনতার অভাব সহ্য করলেই হ'ল, তারপর ত আমরাও বড় হবো।

ফলে শুধু যে আত্মহত্যা করা বন্ধ হ'ল তা'নয়, সেই দিন থেকে সিগারেট খাওয়াও ছেড়ে দিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি কখনো আর সিগারেট স্পর্শ করেন নি। বরং বিশ্ব শুদ্ধ

লোককে সিগারেট খেতে দেখে তিনি বিস্মিতই হ'তেন। তিনি বল্‌তেন, 'ধূমপান করা বর্ব্বরতার লক্ষণ'। শিশুরা মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়বার লোভে সিগারেট খাবার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু বয়স্ক লোকেরা তা'থেকে কি আরাম পায়? এই সময়েই একটা বান্ধুর সঙ্গে মোহনদাসের আলাপ হয়। এই বন্ধুটী যেন তাঁর জীবনে শনিরূপে হাজির হ'য়েছিল। অথচ বাবা-মা এমন কি তাঁর স্ত্রী পর্য্যন্ত এই ছেলেটির সঙ্গে মিশ্‌তে বারণ করেছিলেন। মোহনদাস জান্‌তেন, বন্ধুটীর চরিত্রে অনেক দোষ আছে; কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল, বন্ধুটীর চরিত্র-সংশোধন করা। ফল কিন্তু বিপরিত হ'য়েছিল, বন্ধুকে সংশোধন করতে গিয়ে তিনি নিজেই ভুল পথে চলে গেছলেন।

বন্ধুটীর পাল্লায় প'ড়েই তিনি প্রথম মাংস ভক্ষণ করেন।

গান্ধীজিরা ছিলেন বৈষ্ণব। তাঁর বাবা-মা অত্যন্ত গোঁড়ামির সঙ্গে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আচার ব্যবহার পালন করতেন। বৈষ্ণবদের মাংস-ভক্ষণ নিষিদ্ধ, কারণ তাঁদের প্রাণী-হত্যা করবার অধিকার নেই। তাঁদের মতে মাংস-খাওয়া মহা-পাপ কিন্তু রাজকোটে তখন সংস্কারের প্রবল বন্যা এসেছে।

বন্ধুটী একদিন গান্ধীজিকে বল্লেন, 'জানিস্‌, আমাদে কয়েক মাষ্টার মশায় লুকিয়ে-লুকিয়ে মদ-মাংস খান।'

মোহনদাস বিস্মিত ও ব্যথিতভাবে বল্লেন, 'দূর, বা কথা।'

বন্ধুটী তখন শিক্ষকদেয় নাম-ধাম পর্য্যন্ত বলে গেল।

অবিশ্বাস করবার পথ নেই দেখে মোহনদাস বল্লেন, 'মাংস খাবার কারণ কি ?'

বন্ধুটী তখন বক্তৃতা দিয়ে বোঝাতে লাগল, 'শোন আমরা এত দুর্ব্বল কেন জানিস ? মাংস খাই না ব'লে। ইংরেজেরা সবাই নিয়মিত মাংস খায়,তাই তারা আমাদের দেশ দখল ক'রে নিতে পেরেছে। এই দ্যাখনা, আমি মাংস খাই ব'লে আমার গায়ে কত জোর। আমি কতদূর দৌড়তে পারি। আর সে যায়গায় তুই ? ছোঃ। ভূতের ভয়ে তুই আঁৎকে উঠিস্।'

কথাটা গান্ধীজির মনে লাগল।

বন্ধুটীর ছড়া কেটে বল্লে ঃ—

Behold the mights Englishman.
He rules the Indian small,
Because being a meat-eater
He is five cubits tall.

তারপর বন্ধুটি গান্ধীজিকে মাংস খাবার জন্যে সাধাসাধি করতে লাগলেন। মোহনদাস প্রথম প্রথম কিন্তু-কিন্তু করেছিলেন। শেষকালে একদিন বন্ধু গম্ভীরভাবে বল্লেন, 'তুই তা'হলে ভারতের স্বাধীনতা চাস্ না ? গায়ে জোর না হ'লে ইংরেজদের আমরা তাড়াতে পারবো ভেবেছিস্ ?

এই যুক্তির কাছে তাঁকে মাথা নোয়াতে হ'ল। হ্যাঁ, কিশোর মোহনদাস ভারতের স্বাধীনতা চান্, তাই তাঁর স্বপ্ন।

নিছক্ স্বাধীনতা লাভের আশায় ধর্ম্মের বিধান ভেঙে বাবা মাকে লুকিয়ে মোহদাস একদিন মাংস খাওয়া সুরু করলেন।

বছর-খানেক তিনি মাংস খেয়েছিলেন, কিন্তু এই মিথ্যাচার তাঁকে পীড়া দিতে লাগ্ল। যেদিন তিনি মাংস খেয়ে আস্তেন সেদিন রাত্তির বেলা খাবার সময় তাঁকে বলতে হ'ত, 'মা, আমার ক্ষিধে নেই।' মায়ের কাছে এই মিথ্যা-কথন তিনি বেশী দিন সহ্য করতে পারলেন না। শেষ পর্য্যন্ত মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন।

বিড়ি খাবার জন্যে চাকরদের পকেট থেকে পয়সা-চুরি ছাড়াও আর একবার কৈশোরে তিনি চুরি করেছিলেন তখন তাঁর বয়েস বছর পনেরো। কোন কারণে তাঁর দাদার পঁচিশ টাকা ধার হয়েছিল। ধার শোধ করবার আর কোন পথ নেই দেখে মোহনদাস দাদার বাজুবন্ধ থেকে এক টুক্রো সোনা কেটে নিয়েছিলেন। তারপর সেই সোনা বেচে ধার শোধ করেন।

ধার শোধ হ'ল, কিন্তু চুরি করার কথা ভেবে তিনি অত্যন্ত মনঃকষ্ট পেতে লাগ্লেন। তিনি ঠিক করলেন, বাবার কাছে দোষ স্বীকার করবেন। কিন্তু মুখে বল্লে পাছে বাবাকে বেশী ব্যথা দেওয়া হয়, তাই তিনি আদ্যোপান্ত কাগজে লিখে বাবার হাতে দিলেন। এই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, বাবা যেন তাঁর জন্যে কঠোর শাস্তির বন্দোবস্ত করেন।

করমচাঁদ গান্ধী তখন রোগ শয্যায়। তিনি চিঠিটা ধীরে

ধীরে পড়লেন আর তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে প্‌ড়তে লাগ্‌লো। কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে নিস্তব্ধ থেকে চিঠিটা কুচিয়ে ফেলে দিলেন। পুত্রকে একটীও তিরস্কারের কথা বল্‌লেন না। পিতার ক্ষমাসুন্দর নীরব অশ্রুপাতে গান্ধীজিব চোখেও সজল হ'য়ে উঠ্‌লো। আব সেই চোখের জলে তাঁর অন্তরের সমস্ত কালিমা ধুয়ে মুছে গেল।

গান্ধীজি বল্‌তেন, তাঁব জীবনে অহিংসার সঙ্গে পরিচয় সেই প্রথম।

কৈশোবেব অন্যান্য শিক্ষাব সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রাণ পিতা মাতাব সাহচর্য্যে তিনি ধর্ম্মশিক্ষাও যথেষ্ট পেয়েছিলেন। তবে তার ভেতর, তাঁর সবচেয়ে ভলে লেগেছিল রামায়ন গান।

পোরবন্দরে পিতার সঙ্গে বামায়ন গান শুন্‌তে যেতেন। কথক ঠাকুরের নাম ছিল লাধা মহাবাজ। শোনা যায়, যেদিন থেকে তিনি রামায়ন-পাঠ আবস্ত কবেছিলেন, সেদিন থেকেই তাঁর দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি একদম সেবে গেছ্‌ল। একে তিনি রামভক্ত ছিলেন, তার ওপব তাঁব কণ্ঠস্বব অত্যন্ত সুমিষ্ট ছিল। ফলে, তিনি সহজেই শ্রোতাদেব মনে উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পাবতেন। গান্ধীজি দিনেব পর দিন বিমুগ্ধভাবে তাঁব কথকতা শুনে যেতেন। ছেলেবেলায় ভক্তির এই যে বীজ তাঁর মর্ম্মে প্রবেশ করেছিল, পরে তা' শাখাপ্রশাখা বিস্তার ক'রে বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছিল। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ধর্ম্মপুস্তক ছিল তুলসীদাসের রামায়ণ।

রাজকোটে থাক্‌বার সময়েই কিশোর মোহনদাসের মনে সমস্ত ধর্ম্মের প্রতি একটা সশ্রদ্ধ সহিষ্ণুতার ভাব জেগেছিল। তাঁর পিতামাতা বৈষ্ণব হ'লেও শিব এবং রামের মন্দিরে যাতায়াত করতেন। জৈন সাধুরাও প্রায়ই তাঁদেব বাড়ীতে আস্‌তেন এমন কি তাঁদের কাছ থেকে খাবার ও গ্রহণ কবতেন।

তার ওপর করমচাঁদ গান্ধীব কয়েকজন পার্শী ও মুসলমান বন্ধু ছিলেন। কবমচাঁদ যখন বোগে শয্যাশায়ী, তখন তাঁরা প্রায়ই এসে নানা ধর্ম্মালোচনা করতেন। গান্ধীজি ছিলেন পিতার নার্স। সুতরাং তিনি ঘরে উপস্থিত থেকে তাঁদের কথোপকথন মন দিয়ে শুন্‌তেন। সবকথা অবশ্য বুঝতেন না। শুধু এইটুকু বুঝতেন যে সব ধর্ম্মেব ভেতরই সত্য আছে।

শুধু খৃষ্টান-ধর্ম্মের ওপব তাঁব ছিল প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। তাব খানিকটা কারণ ছিল। খৃষ্টান মিশনারিরা তাঁদের ইস্কুলের কাছে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের ডেকে ডেকে তারস্বরে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দে করতেন। তার ওপর, এই সময় রাজকোটের একজন গণ্যমান্য লোক খৃষ্টান হলেন। শোনা গেল, খৃষ্টান হ'তে গিয়ে তাঁকে গো-মাংস ও মদ খেতে হয়েছে এবং হ্যাট-কোট প্যাণ্ট্‌ প'রে বিলিতি বাঁদর সাজ্‌তে হয়েছে। তিনি ভাব্‌তেন, যে-ধর্ম্মে এত বেশী বাহ্যাড়ম্বর সে-ধর্ম্ম নিশ্চয়ই অন্তঃ-সারশূণ্য।

অবশ্য ধর্ম্মালোচনা শুন্‌লেও ভগবানের সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস তখনও বিশেষ দৃঢ় হয়নি। এবং মনুস্মৃতি প'ড়ে নাস্তিকতার দিকেই তাঁর মন ঝুঁকেছিল। ঐ বইখানিতে সৃষ্টি রহস্যের

কাহিনী হাস্যকর মনে হয়েছিল। তিনি তাঁর জনৈক আত্মীয়কে এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। আত্মীয়টী বল্‌লেন, এনিয়ে এখন মাথা ঘামিও না, বড় হ'লে বুঝ্‌তে পারবে। তবে মনুস্মৃতির একটা কথা তাঁর মনে দৃঢভাবে গেঁথে গেছল। তা' হ'ল, **নীতিই সমস্ত জিনিষের ভিত্তি এবং সত্য হ'ল নীতির প্রাণ।**

তা' ছাড়া একটি গুজরাটি কবিতাও এই সময় তাঁর মন হরণ করেছিল। কবিতাটির সার মর্ম্ম হচ্ছে, মন্দের বদলে ভালো করা। কিশোর মোহনদাস তখন থেকেই এ নিয়ে নানা গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন।

গান্ধীজি—যৌবনে

বাবা মারা যাবার এক বছর পরে ঠিক সতেরো বছর বয়েসে গান্ধীজি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গান্ধী পরিবারের আর্থিক অবস্থা তখন বিশেষ সুবিধাজনক নয়। তাই মোহনদাস বোম্বে না গিয়ে ভাওনগরে শ্যামলদাস কলেজ ভর্ত্তি হলেন। কিন্তু এখানে তাঁহাকে মাসকয়েক মাত্র পড়তে হয়েছিল।

তাঁর বাবার এক ব্রাহ্মণ বন্ধু ছিলেন। গান্ধীজিরা তাঁকে যোশীজি ব'লে ডাক্‌তেন। ছুটিতে গান্ধীজি তখন বাড়ী ফিরেছেন, সেই সময় একদিন যোশীজি এসে হাজির হলেন। তিনি বল্‌লেন, 'মোহনদাসকে এখানে কলেজে পড়িয়ে লাভ কি? চার পাঁচ বছর কলেজে প'ড়ে বি. এ. পাশ ক'রে ষাট টাকা মাইনের চাকরী করবে। পিতার দেওয়ানি পদ ত আর

পাবে না। তার চেয়ে বরং বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারি পড়ে আসুক।' ব'লে মোহন দাসকে জিগেস্ করলেন, 'কি, বিলেত যেতে ইচ্ছে ক'রে ?'

বিলেত ! সাগর পারের রূপকথার দেশ ! নাম শুনেই মোহনদাস আনন্দে নেচে উঠ্লেন। উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন, 'হুঁ ইচ্ছে করে। আমি কিন্তু ডাক্তার হ'য়ে আস্ব।'

গান্ধীজির দাদা আপত্তি করলেন, 'ডাক্তারি পড়তে বাবা বারণ করতেন। বৈষ্ণবের ছেলে হ'য়ে শব-ব্যবচ্ছেদ করবে কি ? বাবা তোমায় আইন পড়াতে চেয়েছিলেন।'

শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হ'ল মোহনদাস বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হ'য়ে আসবেন। কিন্তু অত টাকা পাওয়া যাবে কি ক'রে ? দাদা ছোট ভাইকে খুব ভাল্বাস্তেন। তিনি নিজেদের গয়না বেচে এবং ধার ক'রে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগাড় ক'রে ফেল্লেন। কিন্তু মা পুতলিবাই বেঁকে বস্লেন। তাঁর কোলের ছেলেটিকে অত দূরদেশে একা পাঠিয়ে তিনি থাক্বেন কি করে ? তা' ছাড়া তিনি শুনেছিলেন, সাগরপারের ডাইনিরা এ-দেশের ছেলেদের চোখে মায়া-কাজল পরিয়ে অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়ায়, কুপথে টেনে নিয়ে যায়। ঐ ত দুধের ছেলে, ওকি তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে !

মোহনদাস মাকে বোঝাতে লাগ্লেন, 'মা, তুমি কেন আমায় বিশ্বাস করতে পারছোনা ? আমি কথা দিচ্ছি কোনদিন মদ-মাংস স্পর্শ করবো না। তা' ছাড়া সত্যি-সত্যিই যদি

কিছু বিপদ থাকৃত, তবে কি যোশীজি আমার যাবার কথা বল্‌তেন ?'

শেষে একজন জৈন সাধুর পরামর্শ নিয়ে তিনি মোহনদাসকে শপথ করিয়ে নিলেন, বিলেতে গিয়ে তিনি এমন কোন খাদ্য গ্রহণ করবেন বা এমন কোন কাজ করবেন না যাতে তাঁর জাতির ও ধর্ম্মের কোন বকম অপমান হয়।

মায়ের স্নেহেব বাধা দূর হ'লেও তখনো সমাজেব শাসন বাকী।

মূঢ় বণিক সম্প্রদায়ের কোন লোক আজ পর্য্যন্ত বিলেত যায়নি। সুতরাং মোহনদাস বিলেত যাচ্ছেন শুনে সমাজপতিবা বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। ভাবটা যেন মোহনদাস বিলেত-যাত্রা কবলে হিন্দু ধর্ম্মই বুঝি বা রসাতলে যাবে।

তাঁরা গান্ধীজিকে এক সভায় জবাবদিহি করবার জন্যে ডেকে পাঠালেন।

সভাপতি মন্তব্য করলেন, 'আমাদের মতে তোমার বিলেত যাওয়া চল্‌তে পারে না, কারণ শাস্ত্রে নিষেধ আছে।'

গান্ধীজি সংগ্রাম করবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়েই এসেছিলেন। তিনি দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন, 'না, শাস্ত্রের কোনখানেও এ কথা লেখা নেই।'

সমাজ পতিরা বল্লেন, 'আমরা বল্‌ছি বিলেত গেলে ধর্ম্ম রক্ষা করা যায় না। তোমার প্রতি স্নেহের বশেই, তোমাব ভালোব জন্যেই বল্‌ছি আমরা।'

মোহনদাস বল্লেন, 'আপনাদের চেয়ে আমার মা আমার ভালো মন্দ অনেক বেশী বোঝেন। তিনি যখন সন্তুষ্ট চিত্তে মত দিয়েছেন, তখন এ-সম্বন্ধে কথা বলবার অধিকার আপনাদের নেই।'

অধিকাব ছিল বই কি। অধিকার কুসংস্কাবের, অধিকার মানসিক জড়তাব। সেই আধিকারের জোবেই তাঁরা গান্ধীজিকে সমাজচ্যুত করলেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দেব ৪ঠা সেপ্টেম্বব জুনাগড়েব এক উকিলের সঙ্গে একই কেবিনে মোহনদাস বিলেত যাত্রা করলেন।

পথে কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই তিনি কেবিনে কাটাইতেন। অবশ্য সামুদ্রিক পীড়া তার মোটেই হয়নি। কিন্তু কথা বল্‌বেন কাব সঙ্গে? একে তিনি এমনিতেই লাজুক প্রকৃতি, তার উপর উকিল মজুমদাব মশায় ছাড়া আব সব যাত্রীরা ইংরাজ। তিনি তাদের কথা ভালো ক'বে বুঝ্‌তেও পারেন না, আর ভালো ক'রে ইংরাজি বল্‌তেও পারেন না। খাবার টেবিলে যেতে ও তাঁব সাহস হ'ত না। প্রথমতঃ তিনি কাঁটা চাম্‌চে মোটেই ব্যবহার কবতে জানেন না; দ্বিতীয়তঃ, মেনুতে কোন কোন খাবাব নিরামিষ তা' মুখ খুলে জিগেস্ করতেও পারতেন না। ফলে, তিনি কেবিনেই বাড়ী থেকে আনা ফল-মিষ্ট খেয়ে কাটাতেন।

মজুমদার মশায় তাঁকে বোঝতে চেষ্টা করতেন, যে লোক ব্যারিষ্টার হ'তে যাচ্ছে, তার পক্ষে এ-রকম লাজুকতা

মারাত্মক। তাঁকে চট্‌পট্‌ কইয়ে-বলিয়ে লোক হ'তে হবে। তা' ছাড়া যাত্রীদের সঙ্গে কথা ব'লে ইংরিজি ভাষাটা রপ্ত ক'রে নেওয়া দরকার।

জনৈক ইংরাজ-যাত্রী যেচে গান্ধীজির সঙ্গে আলাপ করলেন। মোহনদাসের লাজুকতা বুঝতে পেয়ে প্রশ্ন ক'রে ক'রে অনেক কথা জেনে নিলেন। মোহনদাসের নিরামিষ-আহারের কথা শুনে হেসে বল্লেন, 'এখনও কথা বলা খুব সোজা। কিন্তু ইংলণ্ডে পৌঁছে দেখ্‌বে এত ঠাণ্ডা যে, মাংস না খেলে বাঁচা যায় না।

গান্ধীজি বল্‌লেন, 'উপায় কি। আমি শপথ করছি যে।'

এই ইংরেজেটির কাছ থেকে মোহনদাস নিরামিস-আহারের সার্টিফিকেট লিখিয়ে নেন্‌। বিলেতে ডাঃ মেহ্‌টার নামে তাঁর কাছে পরিচয় পত্র ছিল। প্রথম দিনেই ডাঃ মেহ্‌টা মোহন-দাসের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কথা বল্‌তে বল্‌তে মোহন-দাস মেহ্‌টার টুপীটা হাতে তুলে নিলেন। হাত বুলিয়ে দেখ্‌তে লাগলেন, কি রকম মসৃন। কিন্তু উল্টা দিকে হাত বুলানোর ফলে টুপীর পশম বিপর্য্যস্ত হ'য়ে গেল। ডাঃ মেহ্‌টা বিরক্ত হ'য়ে গান্ধীজিকে বিলিতি আদব-কায়দা সম্বন্ধে দু'চার কথা শিখিয়ে দিলেন।

ডাঃ মেহ্‌টা বল্‌লেন, অনেক কিছু গ্রাম্য ব্যবহার তাঁকে ভুল্‌তে হবে।

ডাঃ মেহ্‌টা বল্‌লেন, 'দেখ, আমরা বিলেতে শুধু লেখাপড়া

শেখ্‌বার জন্যেই আসি না, ইংরেজদের জীবন যাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাও আমাদের একটা উদ্দেশ্য। তার জন্যে একটী ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে থাকা দরকার। কিন্তু তার আগে কিছুদিন তোমার কারুর কাছে শিক্ষানবিসী করা দরকার, যা'তে উপহাসকর কোন কাজ ক'রে না ফেল। চল, তোমায় একজনের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

ডাঃ মেহ্‌টা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মোহনদাসের আলাপ করিয়ে দিলেন। মোহনদাস এই বন্ধুটীর বাড়ীতেই রইলেন। বন্ধুটী তাঁর প্রতি স'হাদর ভ্রাতার মতই সদয় ব্যবহার করতেন। তিনি সযত্নে ইংরাজি ভাষার ও ইংরাজী আচার-ব্যবহার মার-প্যাঁচ গান্ধীজিকে শিখিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।

কিন্তু গণ্ডগোল বাধলো গান্ধীজির নিরামিষ-আহার নিয়ে। স্রেফ সেদ্ধ-করা লবণহীন শাকসব্জি মোহনদাস খেতে পারতেন না। এদিকে ল্যাণ্ডলেডিও নিরামিষ রান্না কিছু জান্‌ত না। সে বেচারা মোহনদাসকে কি খেতে দেবে ভেবে হিমসিম খেয়ে যেত। যদিও বা কোন রকমে পেটভরে প্রাতঃরাশ খেলেন, লাঞ্চ্‌ বা ডিনারের সময় রুটি খেয়েই তাঁকে কাটাতে হ'ত, কারণ মুখ ফুটে আরও রুটী চাইতে তাঁর লজ্জা করত। ফলে, বেশীর ভাগ দিনই গান্ধীজির অর্দ্ধাহার চল্‌ত।

ব্যাপার দেখে বন্ধুটি গান্ধীজির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে রীতিমত চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। তাঁর ভয় হ'ল এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আধ পেটা খেয়ে মোহনদাস হয়ত অসুখে পড়বেন। তিনি মাংস খাবার

জন্যে গান্ধীজিকে পেড়াপিড়ী করতে লাগ্‌লেন। কিন্তু গান্ধীজি মায়ের কাছে করা, শপথ ভাঙ্‌তে কিছুতে রাজী হলেন না।

শেষকালে একদিন অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে বন্ধুটা বল্লেন, 'তুমি যদি আমার ছোট ভাই হ'তে ত তোমায় সোজা জাহাজে তুলে দেশে চালান ক'রে দিতুম। তোমার অশিক্ষিতা মা ইংলণ্ড সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তিনি যদি জান্‌তেন, মাংস না খেলে তোমাকে অনাহারে থাক্‌তে হবে, তা'হলেও কি আর ঐ শপথ করাতেন? মোহনদাস, ছেলেমানুষী করোনা, আমার কথা শোন।'

কিন্তু মোহনদাস অনড়। তাঁর মুখে সেই কথা, 'আমি শপথ করিছি।'

সেই সময় গান্ধীজির দৈনিক রুটিন্ ছিল এই রকম। তখনো তিনি পড়া শোনা আরম্ভ করেননি। সকালবেলা ব্রেক্‌ফাষ্টের পর তিনি খবরের কাগজ পড়তেন। দেশে থাক্‌তে তিনি একদিনের জন্যও কাগজ পড়েননি। কিন্তু এখানে প্রত্যহ তিন চার-খানা ক'রে কাগজ বেশ মনোযোগের সঙ্গে পড়তেন। তারপর বেরোতেন লণ্ডন সহরে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল নিরামিষ হোটেল খুঁজে বার করা। ল্যাণ্ডলেডির মুখে শুনে ছিলেন, সহরে নাকি ঐ-জাতীয় কয়েকটা হোটেল আছে। লণ্ডনের পথে পথে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ানোর ফলে রোজ প্রায় দশ বারো মাইল হাঁটা হ'ত। ক্ষিধে পেলে

কোন হোটেলে ঢুকে পেটভ'রে মাখন-রুটি খেতেন। কিন্তু শুধু রুটি খেয়ে কেহ সন্তুষ্ট হ'তে পারে?

একদিন অনেক ঘোরাঘুরির পর ক্লান্ত দেহে ফ্যারিংডন্ ষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় রাস্তর ধারে একটা হোটেলের ওপর দৃষ্টি পড়্ল। প্রথমটা তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রথমটা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। চোখ রগ্ড়ে দেখ্লেন, স্পষ্ট লেখা রয়েছে এখানে নিরামিষ-খাদ্য পাওয়া যায়। মাসের পর মাস সমুদ্রে ঘুরতে-ঘুরতে সমুদ্রের বুকে গাছের ডালপালা ভেসে আস্তে দেখে কলম্বাসের মনের ভাব যে রকম ছিল, গান্ধীজির অবস্থাও তখন কতকটা সেই রকম। হোটেলে ঢুকে ইংলণ্ডে আস্বার পর এই প্রথম মোহনদাস পেট ভ'রে আহার করলেন। তারপর সেই হোটেল থেকেই নিরামিষ আহারের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে একখানা বই কিনে বাড়ী ফিরলেন।

বাড়ী ফিরে পুরো বইখানা এক নিঃশ্বাসে প'ড়ে ফেল্লেন। হঠাৎ পাওয়া হোটেলে হঠাৎ পাওয়া এই বইখানা তাঁর জীবনের পরিবর্ত্তন এনে দিল। এতদিন তিনি শপথের খাতিরে জাতের খাতিরে নিরামিষ আহার করতেন, কিন্তু মাংসাহারের উপকারিতা অস্বীকার করতেন না। কিন্তু বইখানা পড়বার পর থেকে তিনি স্বেচ্ছায় নিরামিষাহারী হলেন। বুঝ্লেন, মানুষ যদি নিজেকে পশুর চেয়ে বড় ব'লে প্রমাণ করতে চায় ত আমিষ আহার তাকে ত্যাগ করতে হবে।

মোহনদাস নিরামিষ আহার সংক্রান্ত বই নিয়ে গবেষণা করছেন দেখে বন্ধুটী বিশেষ দুর্ভাবনায় পড়লেন। তাঁর ধারণা হ'ল, নিরামিষ খাদ্য নিয়ে মাতামাতি করা হয়ত গান্ধীজির বাতিক হ'য়ে দাঁড়াবে। তিনি হতাশভাবে বল্লেন, 'মোহনদাস' তোমার খাওয়া-দাওয়ার যা' ছিরি দেখ্‌ছি তা'তে তুমি কখনো সভ্য-সমাজে মিশ্‌তে পারবে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে।'

এ কথায় গান্ধীজির পৌরুষ জেগে উঠ্‌ল। ঠিক করলেন, খাওয়া সম্বন্ধে বাছ-বিচার থাকলেও তিনি যে পুরো দস্তুর সাহেব সাজ্‌তে পারেন, তা, বন্ধুকে দেখিয়ে দিতে হবে। আরম্ভ হ'ল তাঁর খাঁটি সাহেব হবার প্রচেষ্টা।

প্রথমেই বোম্বের জামা-কাপড় বাতিল ক'রে আর্মি-নেভিষ্টোর থেকে নতুন স্যুট করালেন। উনিশ শিলিং দিয়ে একটা চিমনীর মত হ্যাট্ কিনলেন। নগদ দশ পাউণ্ড দিয়ে বণ্ড ষ্ট্রীট থেকে তাঁর সান্ধ্য-পোষাক প্রস্তুত হ'ল। দাদাকে লিখ্‌লেন, ঘড়ির চেন্ পাঠাও। আগে কাল ভদ্রে কখনো আরসীতে মুখ দেখ্‌তেন। এখন রোজ দশমিনিট ধ'রে একটি বড় আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করতে লাগলেন। প্রথমে কায়দা ক'রে টাই বাঁধতেন; তারপর অবাধ্য চুলকে অনেক কষ্টে বুরুষ দিয়ে বাগ মানিয়ে পরিপাটি ক'রে টেরি কাটতেন।

তারপর শুনলেন' শুধু সাজ পোষাকেই সাহেব সাজা যাবে না। পুরোপুরি সভ্য হ'তে গেলে আরও তিনটে জিনিষ শিখ্‌তে

হবে—নাচ, ফরাসী ভাষা, ও আবৃত্তি। তিন পাউণ্ড খরচ ক'রে নাচ শিখ্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু মুস্কিল হ'ল পিয়ানোর সঙ্গে ঠিক তাল রাখ্‌তে পারলেন না। সুতরাং তালজ্ঞান করবার জন্যে একজন শিক্ষয়িত্রির কাছে বেহালা বাজানো

বিলাতে অধ্যয়ন কালে মহাত্মা গান্ধী

শিখ্‌তে সুরু করলেন। আবৃত্তি শেখাবার জন্যেও আর একজন শিক্ষক ঠিক হ'ল।

এই পাগলামি অবশ্য বেশীদিন চল্‌লো না। হঠাৎ একদিন

তাঁর চমক্ ভাঙ্‌লো, এ আমি কি করছি? আমি ছাত্র, অধ্যয়ন আমার তপ, এসব কাজ ত আমার জন্যে নয়। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে সাহেব সাজ্‌বার চেষ্টা দূর হ'ল। নাচ ও আবৃত্তির স্কুল ছেড়ে দিলেন। বেহালাটা বেচে একটা ষ্টোভ্ কিন্‌লেন। সহর ছেড়ে সহরতলীতে অল্প ভাড়ায় একখানা ঘর নিলেন এবং নিজেই রান্নাবান্না করতে লাগ্‌লেন। আগে কোথাও যেতে হ'লে গাড়ীতে উঠতেন, এখন হেঁটেই যাওয়া-আসা সুরু করলেন। ফলে, প্রত্যেক মাসে তাঁর খরচ হ'তে লাগ্‌লো মাত্র চার পাউণ্ড।

বেহিসেবী তিনি কোন দিনই ছিলেন না। খুঁটি-নাটি হিসেব রাখা তাঁর একটা অভ্যেস। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা তিনি খাতায় হিসেব লিখ্‌তেন—এক পয়সার হিসেব ও তা'তে বাদ পড়ত না। ফলে, সাহেব সাজবার সময়ও তাঁর খরচ কখনো সাধ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়নি। কিন্তু এখন খরচ খুব কমে যাওয়ায় এবং হাতে যথেষ্ট সময় থাকায় তিনি আইন ছাড়াও আর একটা কিছু পরীক্ষা দেবেন, ঠিক করলেন। এক বন্ধুর পরামর্শে লণ্ডনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করবার জন্যে পড়াশোনা করতে লাগ্‌লেন। ল্যাটিন পড়তে হবে দেখে প্রথমটা ভয় পেয়ে তিনি পেছিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বন্ধু বল্লেন, আইন-জীবিদের ল্যাটিন্ জানা দরকার। অতএব, পরীক্ষার পড়া এবং নিরামিষ-আহায্য নিয়ে নানা গবেষণা ক'রে তাঁর সময় বেশ ভালভাবেই কাট্‌তে লাগ্‌লো।

এই নিরামিষ আহারের ব্যাপারে এই সময় মোহনদাসের সঙ্ঘ-গঠন ও পরিচালনার শক্তি প্রকাশ পায়। তখন বিলেতে নিরামিষ আহারের প্রচারের জন্যে কয়েকটি সঙ্ঘ ছিল। গান্ধীজি উদ্যোগী হ'য়ে নিজের পল্লী বেজ্‌ওয়াটারে এই রকম একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ডাঃ ওল্ডফিল্ড ছিলেন তার প্রেসিডেন্ট্ এবং গান্ধীজি নিজে ছিলেন সেক্রেটারি। এই সমিতিতে নিরামিষ আহার সম্বন্ধে নানা-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হ'ত। কিন্তু সেক্রেটারি হ'য়েও মোহনদাস এই বিতর্কে যোগ দেননি। তার কারণ, তাঁর অদ্ভুত লাজুকতা। সভায় কোন কথা বল্‌তে উঠ্‌লেই তাঁর কান লাল হ'য়ে যেত, গলা শুকিয়ে উঠ্‌ত, হাত-পা কাঁপ্‌ত এবং দু'একটা কথা ব'লে তোৎলাতে-তোৎলাতে ব'সে পড়তেন। এমনকি তাঁর লিখে-আনা বক্তৃতাও নিজে পড়তে পারতেন না, অন্য লোকে প'ড়ে দিত। ডাঃ ওল্ডফিল্ড্ গান্ধীজিকে বল্‌তেন, 'তুমি ত আমার সঙ্গে বেশ কথা বলো হে, কিন্তু সভায় কিছু বল্‌তে গেলে তোমার জিভে কি ব্যাধি হয়?'

জিভের এই আড়ষ্টতা দূর হ'তে তাঁর আরও কয়েক বছর লেগেছিল। এই লাজুক মূকতা তিনি ভুল্‌তে পেরেছিলেন, যখন দক্ষিণ-আফ্রিকার দুর্গতদের সাহায্য করতে এগিয়ে গেছ্‌লেন।

লণ্ডনে মোহনদাসের ধর্ম্মশিক্ষাও স্পষ্ট রূপ ধারণ করেছিল দু'জন থিওসফিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে তিনি গীতা পড়া আরম্ভ করেন

সংস্কৃত জ্ঞান অল্প হওয়ায় গীতার ইংরাজি অনুবাদ পড়তে থাকেন। পড়তে পড়তে যেন তাঁর মনের চোখ খুলে গেল। সত্যকে উপলব্ধি করবার একটা আবছা ইঙ্গিত যেন তিনি পেলেন। তারপর পড়লেন এড্‌উইন আরনল্ডের লেখা 'লাইট অফ্ এশিয়া, (বুদ্ধ চরিত)। বুদ্ধের বাণী আরনল্ডের মধুর ভাষায় তাঁর কানে অনুক্ষণ বাজ্‌তে লাগ্‌ল। এই সময় ম্যান্‌চেষ্টারে একজন খৃষ্টানের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁর পরামর্শ মত মোহনদাস বাইবেল পড়া সুরু করলেন। প্রথম প্রথম তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি, ওল্ড্‌টেস্‌টামেণ্ট্ পড়তে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তারপর নিউ টেস্‌টামেণ্ট্ পড়তে গিয়ে তিনি চমকে উঠ্‌লেন। রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে যীশুর অমর-বাণী 'সারমন্ অন্ দি মাউণ্ট্' প'ড়ে গেলেন। বারবার প'ড়েও যেন তৃপ্তি হ'ল না। বুঝ্‌লেন, **ত্যাগই ধর্ম্মের পরমতম প্রকাশ।** তাঁর কুড়িবছরের তরুণ মন গীতার কর্ম্মবাদ, বুদ্ধের অহিংসা এবং যীশুর প্রেম এই তিনটার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আন্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো। তাঁর আত্মা যেন চিরসুন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবার পাথেয় সংগ্রহ ক'রে নিল।

কিন্তু ধর্ম্ম নিয়ে বেশী চিন্তা করবার সময় ছিল না, কারণ আইনের পুস্তকগুলি পড়া দরকার। অবশ্য পড়াশোনার খুব বেশী দাম ছিল না। লোকে তাঁদের ঠাট্টা ক'রে বল্‌ত 'ডিনার-ব্যারিষ্টার।' ব্যারিষ্টার হ'তে গেলে তু'টো কাজ করতে হ'ত, এক পরীক্ষায় পাশ করা, তুই চব্বিশটার ভেতর অন্ততঃ ছ'টা

ডিনারে যোগ দেওয়া। অবশ্য ডিনার খেতেই হবে তার কোন মানে নেই, শুধু টেবিলে হাজির হ'লেই হ'ল। গান্ধীজি নিরামিষ খেতেন, তাই তিনি শুধু একবার হাজিরা দিয়ে চ'লে আস্‌তেন। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অন্য ছেলেরা তাঁকে ছাড়ত না। তাঁর ভাগের মদের বোতল পাবার জন্যে তাঁকে নিয়ে কাড়া-কাড়ি প'ড়ে যেত।

যাই হোক্, যেটুকু পড়বার ছিল মন দিয়ে প'ড়ে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন তিনি ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় পাশ করলেন এবং তার দু'দিন পরেই স্বদেশ যাত্রা করলেন। তিন বছর বিদেশে কাটিয়ে প্রিয়জনদের সঙ্গে পুর্নমিলিত হবার উগ্র আশা বুকে নিয়ে গান্ধীজি বোম্বে পৌঁছলেন। কিন্তু দেশে ফিরেই তিনি একটা বড় রকমের আঘাত পেলেন। শুন্‌লেন, তাঁর মা মারা গেছেন। বিলেতে থাক্‌তে-থাক্‌তেই মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। পাছে বিদেশে মোহনদাস শোকে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েন, তাই এতদিন এ খবর তাঁকে জানানো হয়নি। কিন্তু দেরীতে এ-সংবাদ পেলেও বেদনার তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র কম হ'ল না। বিশেষ ক'রে তিনি আশা করেছিলেন, শপথ-রক্ষার কথা শুনিয়ে তিনি মায়ের মুখে গর্ব্ব-মিশ্রিত আনন্দের হাসি ফুটিয়ে তুল্‌বেন। কিন্তু শোকে নত হ'য়ে থাক্‌লে ত আর চল্‌বে না। সাম্‌নে তাঁর অনেক কাজ।

প্রথমেই কথা উঠ্‌লো সমাজ সম্বন্ধে। বিলেত যাবার সময় তিনি সমাজ-চ্যুত হয়েছিলেন। এখন তিনি ফিরে আসায়

তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে দু'টো দল হ'য়ে গেল। একদল তাঁর সঙ্গে কোনরকম সমাজগত সম্পর্ক রাখ্‌তে রাজী হ'ল না। সবচেয়ে আশ্চর্য্য, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত গান্ধীজি এই দলের চোখে জাতিচ্যুত ছিলেন। আর একদল একটি সর্ত্ত অনুযায়ী তাঁকে গ্রহণ করতে রাজী হ'ল। গান্ধীজি প্রথমে এই সর্ত্ত মান্‌তে রাজী হন্‌নি। শেষ পর্য্যন্ত দাদার একান্ত আগ্রহে অনিচ্ছার সঙ্গে এই সামাজিক অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন। নাসিকে গিয়ে পবিত্রবারিতে স্নান ক'রে দেশে ফিরে সমাজের সকলকে একটি ভোজ দিয়ে তিনি জাতে ওঠেন।

বিলেতে ডাঃ মেহ্‌টার সঙ্গে গান্ধীজির আলাপ হয়েছিল। বোম্বাইতে ডাঃ মেহ্‌টা গান্ধীজিকে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি মোহনদাসের সঙ্গে কবি রাজচন্দ্রের আলাপ করিয়ে দিলেন। রাজচন্দ্রের অদ্ভুত স্মরণ-শক্তি ছিল—একবার শুনে তিনি যে কোন জিনিষ হুবহু পুণরাবৃত্তি করতে পারতেন। প্রথম আলাপেই মোহনদাস রাজচন্দ্রের এই ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন কবির অন্তরের পরিচয় পেয়ে। রাজচন্দ্র হীরা-জহরের ব্যবসায়ী ছিলেন,—লক্ষ-লক্ষ টাকা নিয়ে তাঁকে কারবার করতে হ'ত। কিন্তু এগুলো যেন তাঁর কাছে ছিল শুধু খেলা। তাঁর জীবনের আসল লক্ষ্য ছিল, দিনের প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক স্থানে ভগবানের আবির্ভাব অনুভব করা। নানা ধর্ম্ম-গ্রন্থ সম্বন্ধে রাজচন্দ্রের জ্ঞান ছিল সুগভীর। মোহনদাস তাঁকে যথেষ্ট ভক্তি করতেন; কবির

সঙ্গে প্রায়ই তাঁর নানা ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা হ'ত। গান্ধীজি জীবন-চরিতে লিখে গেছেন, 'জীবনে আমি অনেক ধর্ম্ম-গুরুর সাক্ষাৎ পেয়েছি, কিন্তু রাজচন্দ্রের মত ধর্ম্মকথা ব'লে আর কেউ আমার মনে এতখানি ছাপ ফেল্‌তে পারেনি।'

কিন্তু ধর্ম্মের চেয়ে তখন প্রয়োজন বেশী অর্থের। সুতরাং গান্ধীজি বোম্বে হাইকোর্টে প্রাক্‌টিশ্‌ সুরু করলেন। প্র্যাক্‌টিশ্‌ অবশ্য নামেই—কারণ দিনের পর দিন তাঁর কোর্টে যাওয়া-আসাই সার হ'ল। একটিও মক্কেল জুট্‌লো না, এক পয়সাও উপার্জ্জন হ'ল না। শেষকালে একদিন একটি ছোটখাট মোকদ্দমা জুটে গেল—মক্কেলের কাছ থেকে ত্রিশ টাকা ফি-স্বরূপ গ্রহণ করলেন। এই প্রথম তিনি কোর্টে মকদ্দমা চালাতে এলেন। আসামী-পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করবার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু একঘর লোকের দিকে চেয়ে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগলো; মনে হ'ল সেই সঙ্গে ঘরশুদ্ধ লোকও ঘুর্‌ছে। প্রশ্ন করবার মত কোন কথাই তাঁর মাথায় এল না। জজসাহেব এবং অন্যান্য উকিল-ব্যারিষ্টাররা মুখ টিপে হাস্‌তে লাগ্‌ল। ঘর্ম্মাক্তদেহে গান্ধীজি ব'সে পড়লেন। এবং পরে মক্কেলকে টাকা ফিরিয়ে দিলেন।

বুঝ্‌লেন, আপাততঃ ব্যারিষ্টারি বন্ধ রাখতে হবে, তা' না হ'লে ঐভাবে লোকের কাছে উপহাসের পাত্র হ''য় উঠবেন। কিন্তু টাকার যে একান্ত প্রয়োজন। ঠিক করলেন, ইস্কুলে শিক্ষকতা করবেন। একদিন বিজ্ঞাপন দেখলেন, প্রত্যহ এক

ঘণ্টা ইংরাজি পড়াবার একজন শিক্ষক আবশ্যক, বেতন ৭৫৲ টাকা। দরখাস্ত দিয়ে দেখা করতে গেলেন। হেড্‌মাষ্টার বল্লেন, 'আপনি ত গ্র্যাজুয়েট্ নন্। সুতরাং আপনাকে নিই কি ক'রে?'

গান্ধীজি বল্‌লেন. 'কিন্তু আমি লণ্ডন ম্যাট্রিক দিয়েছি। আমার ল্যাটিন ছিল।'

হেডমাষ্টার অমায়িকভাবে বল্‌লেন, 'তা' হবে। কিন্তু আমরা গ্র্যাজুয়েট চাই।'

ফলে, শিক্ষক হবার চেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল।

রাজকোটে তাঁর দাদা উকিল ছিলেন। গান্ধীজি বোম্বে ত্যাগ ক'রে রাজকোটেই উপস্থিত হলেন। এখানে তাঁর দাদার চেষ্টায় একটু-একটু ক'রে অর্থাগম হ'তে লাগল এবং অচিরেই আরও বেশী হয়ত উপার্জ্জন হ'ত, কিন্তু এই সময় একটা ঘটনা ঘটল। গান্ধীজির জীবনের আর একটি পরিচ্ছেদ আরম্ভ হ'ল।

কাথিয়াবাড় রাজ্যের পোলিটিক্যাল এজেণ্টের সঙ্গে গান্ধীজির দাদার অপ্রিয়কর সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা যায়। বিলেতে এই এজেণ্টটীর সঙ্গে গান্ধীজির যথেষ্ট আলাপ ছিল। সেই সূত্রেই দাদার হ'য়ে ওকালতি করবার জন্যে এজেণ্টে্টীর কাছে গেলেন। কিন্তু বিলেতের ভদ্র-সাহেব যে ভারতবর্ষে এলে বেলকুল ভোল পাল্টে ফেলে ক্ষমতা-দম্ভে ধরাকে সরাজ্ঞান করে, এ কথা জান্‌তে বাকী ছিল। এজেণ্ট্‌টী পুরানো বন্ধুত্ব

সম্পূর্ণ বিস্মিত হ'য়ে গান্ধীজিকে অভদ্রের মত অপমান করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত পেয়াদা দিয়ে তাঁকে ঘর থেকে বা' ক'রে দেন।

গান্ধীজি অপমানে জ্বলে উঠ্‌লেন। ঠিক করলেন, এর প্রতিকার চাই। কিন্তু তাঁর বন্ধু বান্ধবরা তাঁকে নিরস্ত করতে লাগ্‌লেন। তাঁরা স্পষ্টই বল্লেন, সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা করলে সাহেব অক্ষতই থাক্‌বেন, কিন্তু মোহনদাসের যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সুতরাং বাধ্য হ'য়ে তাঁকে এই অপমান সহ্য ক'রে যেতে হ'ল।

রাজকোটে মোহনদাসের কাজ ছিল এই সাহেবেরই এজ-লাসে। সুতরাং এর পর থেকে তাও বন্ধ হ'ল। কিন্তু না গেলে টাকা উপার্জ্জনের কি বন্দোবস্ত হবে? এমন সময় দক্ষিণ আফ্রিকার দাদা আবদুল্লা কোং মোহনদাসকে নেটালে একটী জটিল মামলা-সংক্রান্ত কাজে পাঠাতে অনুরোধ করলেন। গান্ধীজি সানন্দে সেই আমন্ত্রন গ্রহণ করলেন। একদিকে অর্থ-সমস্যার সমাধান আর এক দিকে নতুন দেশের নতুন মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি আফ্রিকা যাত্রা করলেন।

গান্ধীজি—দক্ষিণ আফ্রিকায়

আফ্রিকা, যেখানে আদিম মানুষ প্রথম চোখ মেলে চেয়ে-ছিল।

আফ্রিকা, হিংস্র গরিলা ও হিংস্র ব্ল্যাক্ মাম্বার জন্মভূমি।

আফ্রিকা, হিংস্রতর শ্বেতাঙ্গের উগ্র দম্ভ ও জাত্যভিমানের লীলাক্ষেত্র।

আফ্রিকা, যেখানে মানুষের ইতিহাস নতুন ক'রে লেখা হ'য়েছিল।

আফ্রিকা, বিংশ শতাব্দীর দেবদূতের জয়যাত্রার প্রথম সোপান।

আগেকার কালে লোকে এই আফ্রিকাকে 'অন্ধকার মহাদেশ' বল্‌ত। মনে হয় যেন সেই অন্ধকার ঘন বন-জঙ্গল পরিত্যাগ ক'রে আফ্রিকাবাসী শ্বেতাঙ্গের মনে বাসা বেঁধেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছুবার দিনকয়েকের ভেতরই গান্ধীজি এই অন্ধ-আত্মার নির্লজ্জ প্রকাশের সম্মুখীন হলেন।

প্রথম প্রকাশ হ'ল ডার্ব্বানে পৌঁছবার দিন তিনেক পরে। দাদা আবদুল্লার সঙ্গে তিনি আদালত দেখ্‌তে গেলেন। আবদুল্লা সেখানে দু'চারজনের সঙ্গে গান্ধীজির আলাপ করিয়ে দিয়ে এজলাসের মধ্যে তাঁদের এটর্নীর পাশে তাঁকে বসিয়ে দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ ঘন ঘন গান্ধীজির দিকে চাইতে লাগ্‌লেন এবং শেষ পর্য্যন্ত হুকুম দিলেন, 'তোমার পাগ্‌ড়ী খুলে ফেল।'

গান্ধীজি এই অন্যায় হুকুম মান্‌তে রাজী হলেন না। কোর্ট ছেড়ে তক্ষুনি চ'লে এলেন।

আবদুল্লা মোহনদাসকে বুঝিয়ে দিলেন, কেন তাঁর ওপর পাগড়ী খোলবার হুকুম হয়েছিল। তিনি যদি মুসলমানদের

পোষাক পরতেন ত পাগড়ী খোল্‌বার প্রয়োজন হ'ত না। অন্য ভারতীয়দের কিন্তু সে অধিকার নেই।

শুন্‌লেন, ভারতীয়দের ভেতর কয়েকটী দল আছে। এক-দল মুসলমান ব্যবসায়ীরা—তারা নিজেদের পরিচয় দিত আরব ব'লে। পার্শী কেরাণীরা নিজেদের বল্‌ত পারস্যদেশীয়। আর হিন্দু-কেরাণীরা গত্যন্তর হ'য়ে আরবদের দলে মিশ্‌ত। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল তামিল, তেলেগু ও উত্তর ভারতীয় স্বাধীন অথবা চুক্তিবন্দী মজুরের দল। ইংরেজরা তাদের বল্‌ত কুলী। যেহেতু এই মজুররা দলে বেশী, তাই ইংরেজদের চোখে ভারতীয় মাত্রেই কুলী। লক্ষপতি ব্যবসায়ী 'কুলী ব্যবসায়ী', উচ্চ-শিক্ষিত শিক্ষক 'কুলী শিক্ষক', ভারতীয়দের পল্লী 'কুলী-পল্লী', ভারতীয় বণিকদের জাহাজ 'কুলী জাহাজ'। গান্ধীজির পরিচয় হ'ল 'কুলী-ব্যারিষ্টার।'

এই অবস্থায় পাগড়ী খোলার মানেই অপমান হজম করা। অপমান এড়াবার জন্যে গান্ধীজির সাহেবদের টুপী পরবেন ঠিক করলেন। কিন্তু আবদুল্লা প্রতিবাদ করলেন, "তবে আমাদের অবস্থা কি হবে? আপনি যদি টুপী পরেন, তবে যারা পাগড়ী পরতে চায় তারা কি ভাব্‌বে বলুন ত?'

কথাটা মোহনদাসের মনে লাগ্‌ল। আদালতের ঘটনা বিবৃত ক'রে এবং পাগাড়ী-পরার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি কাগজে এক চিঠি পাঠালেন। ফলে দেখ্‌তে-দেখ্‌তে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির নাম ছড়িয়ে পড়লো। শ্বেতাঙ্গেরা তাঁকে

বল্লেন 'রবাহুত অতিথি', কিন্তু ভারতীয়রা তাদের হ'য়ে কথা বলবার লোক পেয়ে আনন্দিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

আবদুল্লা কোম্পানীর মামলাটী চলছিল ট্রান্সভাল প্রদেশের প্রিটোরিয়া নগরে। দিন পাঁচেক ডার্ব্বানে থেকে মকদ্দমার কাগজপত্র বুঝে নিয়ে একটী প্রথম শ্রেণীর কামরায় গান্ধীজি প্রিটোরিয়া যাত্রা করলেন।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটী হ'ল এই প্রিটোরিয়ার পথে। রাত্রি প্রায় নটার সময় ট্রেন নেটালের প্রধান সহর মেরিট্‌জবার্গে এসে থাম্‌ল। একজন শ্বেতাঙ্গ যাত্রী মোহনদাসের কামরায় এসে উঠ্‌ল। সেই কামরায় মোহনদাস একা ছিলেন। শ্বেতাঙ্গটী মোহনদাসের কালো চামড়ার দিকে বার কয়েক দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বেরিয়ে গিয়ে একজন রেল কর্ম্মচারীকে ডেকে নিয়ে এল। কর্ম্মচারীটী এসেই উগ্রভাবে গান্ধীজিকে বললে, 'তৃতীয় শ্রেণীতে যাও। এ গাড়ী তোমাদের জন্যে নয়।'

গান্ধীজি বল্লেন, 'কিন্তু আমার প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে।'

'তাতে কি হয়েছে? যা' বল্‌ছি শোন। চট্‌পট্‌ নেবে যাও, নয়ত পুলিশ ডাক্‌ব।'

গান্ধীজি শান্তস্বরে উত্তর দিলেন, 'তাই ডাক। আমি নিজে থেকে নাব্‌তে রাজী নই।'

কনষ্টেবল এসে গান্ধীজির একটা হাত ধ'রে এক ধাক্কায় কাম্‌রা থেকে তাঁকে বার ক'রে দিল। আর তাঁর জিনিষপত্র

প্লাটফরমের ওপর ছুঁড়ে ফেল্‌ল। গান্ধীজি তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে রাজী হলেন না। সুতরাং ট্রেন চলে গেল এবং গান্ধীজি ওয়েটিং রুমে গিয়ে বস্‌লেন।

ওয়েটিং-রুমে একে মোটেই আলো নেই, তার ওপর মেরিট্‌জ্‌বার্গে প্রচণ্ড শীত। সেই অন্ধকারে শীতে কাঁপতে-কাঁপতে মোহনদাস প্রতিজ্ঞা করলেন, সাদা চামড়ার এই উদ্ধত দম্ভ ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন, এই উগ্র জাত্যভিমান সমূলে ধ্বংস করবেন। তাঁর এই প্রতিজ্ঞা শুনে হয়ত রিথটার্‌স্‌-ভেল্ডের চূড়া ক্ষণিকের জন্যে কেঁপে উঠেছিল।

পরদিন তিনি চার্লস্‌-টাউন পৌঁছলেন। কিন্তু তখনও তাঁর হেনস্থার কিছু বাকী ছিল। তখন চার্লস্‌-টাউন ও জোহান্সেস্‌-বার্গের মাঝে রেল ছিল না, ঘোড়ার গাড়ীতে যাতায়াত চল্‌ত। এই গাড়ীগুলি অনেক লম্বা হ'ত—নাম ছিল ষ্টেজ্‌-কোচ। সাধারণতঃ চালকের পাশে চালের ওপর গাড়ীর সর্দ্দারের বস্‌বার কথা। কিন্তু যাত্রীদের ভেতর গান্ধীজিকেই একমাত্র কৃষ্ণকায় দেখে সর্দ্দারটী নিজে ভেতরে ব'সে গান্ধীজিকে চালে বস্‌তে দিল। বেলা তিনটা নাগাদ এক যায়গায় গাড়ী থাম্‌ল। সর্দ্দারটী এক টুকরো নোংরা ও দুর্গন্ধময় নেক্‌ড়া পাদানিতে পেতে মোহনদাসকে সম্বোধন ক'রে বল্লে, 'স্বামী, তুমি এই খানে ব'স, আমি একটু ধূমপান করব।'

শ্বেতাঙ্গরা ভারতীয়দের যেমন কুলী বল্‌ত, তেমনি মাঝে মাঝে তাচ্ছিল্য করবার জন্যে 'স্বামী' কথাটাও ব্যবহার করত।

গান্ধীজি অপমান-কম্পিতস্বরে বল্লেন, 'এখানে তোমারই বস্‌বার কথা, অথচ বসিয়েছ আমাকে। সে অপমান আমি সহ্য করেছিলুম। এখন তুমি ধূমপান করবে আর আমি তোমার পায়ের কাছে বসবো, না ? তা' হবে না, আমি ভেতরে গিয়ে বস্‌তে রাজী আছি।'

লোকটা রাগে ক্ষেপে গিয়ে গান্ধীজির কানে, নাকে, মুখে অনেকগুলো ঘুঁষি চালালো। তারপর তাঁর হাত ধ'রে টেনে নাবাতে চেষ্টা করতে লাগ্‌লো। তিনিও দুর্ব্বল-হস্তে রেলিং ধ'রে প্রাণপণে যুঝ্‌তে লাগ্‌লেন। যাত্রীরা এই অসম-যুদ্ধ দেখে লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে, 'সর্দ্দার' ছেড়ে দাও ওকে। ওর দোষ কোথায় ? তুমি ওখানে বস্‌তে চাও ত ও এসে ভেতরে বসুক না।' এই কথা শুনে কিন্তু লোকটা আরও চ'টে গেল। দাঁতে-দাঁত চেপে মোহনদাসকে শাসালো, এর পরে গাড়ী থাম্‌লে তাঁকে দেখে নেবে।

যাই হোক্‌, তিনি নির্ব্বিঘ্নে জোহান্নেসবার্গ পৌঁছলেন। কিন্তু পথের ঘটনায় তাঁর যেন রোখ্‌ চড়ে গেল। তিনি ঠিক করলেন, প্রথম শ্রেণীতেই সেখান থেকে প্রিটোরিয়া যাবেন। সেই উদ্দেশ্যে ষ্টেশন-মাষ্টারকে একটা বার্থ্‌ রিজার্ভ্‌ ক'রে রাখ্‌তে লিখ্‌লেন। কারণ ভারতীয়দের বিনা-অনুমতিতে প্রথম শ্রেণীর টিকিট্‌ বেচ্‌বার হুকুম ছিল না। ষ্টেশনে গান্ধীজি টিকিট কাট্‌তে গেলে ষ্টেশন-মাষ্টার প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আমায় চিঠি লিখেছিলেন ?

গান্ধীজি বল্‌লেন, 'হাঁ, আমার তাড়া আছে, আজ্‌কেই প্রিটোরিয়া যেতে হবে।'

ষ্টেশন-মাষ্টার মৃদু হেসে বল্লেন, 'আমি ট্রান্সভালের লোক নই। আমি খাঁটি ওলন্দাজ। আমি আপনার মনের ভাব বুঝ্‌তে পার্‌ছি। আপনার ওপর আমার সহানুভূতিও আছে যথেষ্ট, কিন্তু আমাকে চাক্‌রী রাখ্‌তে হবে। তাই বলছি এক সর্ত্তে আপনাকে টিকিট দিতে পারি, পথে যদি গার্ডের সঙ্গে আপনার গণ্ডগোল হয় ত দয়া ক'রে রেল কোম্পানীর নামে মামলা করবেন না।' গান্ধীজি স্টেশন-মাস্টারকে ধন্যবাদ দিয়ে ট্রেনে উঠ্‌লেন। একটা ষ্টেশনে গার্ড এল টিকিট দেখ্‌তে। মোহন দাসকে প্রথম শ্রেণীতে দেখে তার মেজাজ সপ্তমে চড়লো। চেঁচিয়ে বল্‌লে, 'এই তুমি এখানে কি করতে? যাও, যাও থার্ড ক্লাসে।'

কামরায় আর একটী ইংরেজ-যাত্রী ছিলেন। তিনি গার্ডকে ধমক লাগালেন, 'ভদ্দরলোককে কেন বিরক্ত করছ দেখছ, ওঁর প্রথম শ্রেণীর টিকিট রয়েছে। যাও, বেশী গণ্ডগোল কর' না।' গার্ড বল্লে, 'আপনি যদি কুলির সঙ্গে যেতে চান্ আমার কি।'

এই পথযাত্রার মধ্যে দু'রকমের লোকই মোহনদাস দেখ্‌লেন। বুঝলেন, শ্বেতাঙ্গদের ভেতরও মানুষের অভাব নেই। পরে তিনি যখন ভারতীয়দের অধিকারের জন্যে আন্দোলন সুরু করলেন, তখন এইরকম অনেক শ্বেতাঙ্গের সাহচর্য্য ও সহানুভূতি লাভ করে ছিলেন।

প্রিটোরিয়ায় পৌঁছে তাঁর পথের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। সেখানকার ভারতীয়েরা তাঁর কথা শুনে বল্লে, 'আপনি এতেই বিস্মিত হচ্ছেন, এখানে থাক্‌তে-থাক্‌তে দেখবেন আমাদের আরও কত অত্যাচার সহ্য করতে হয়।'

যুবক মোহনদাস তীব্রভাবে বল্‌লেন, 'আপনারা কেউ প্রতিকারের চেষ্টা করেন না?'

'প্রতিকার! প্রতিকার কে করবে, কি ক'রে করবে?'

গান্ধীজি বুঝলেন, ভারতীয়দের দুর্বলতা কোথায়। এদের সবল করতে হ'লে প্রথমে দূর করতে হবে এদের দলাদলির মনোভাব, জাগাতে হবে এদের আত্ম-বিশ্বাস। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্রথমেই প্রিটোরিয়ার ভারতীয়দের একটা সভায় আহ্বান করলেন।

জীবনে এই প্রথম তাঁর সাধারণের সভায় বক্তৃতা দেওয়া। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য, তাঁর এতদিনকার লাজুক মূকতা যেন ভোজবাজির মত অন্তর্হিত হ'ল। সেদিন তাঁর বক্তৃতা শুনে সভার সকলেই মুগ্ধ ও বিচলিত হ'য়ে পড়ে। তাঁর কথা অনুযায়ী প্রিটোরিয়ার ভারতীয়েরা সম্মিলিত হ'য়ে একটা সঙ্ঘ-গঠন করে। এই সঙ্ঘের নানা উদ্দেশ্যের মধ্যে শিক্ষাদান ছিল একটি। মোহনদাস নিজে এই ভার গ্রহণ করেন।

অবসর সময়ে তিনি ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটে ভারতীয়-দের অবস্থা সম্বন্ধে খবরাখবর নিতে থাকেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে একটী আইন অনুযায়ী অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটে ভারতীয়দের সমস্ত

অধিকার হরণ করে নেওয়া হয়। সামান্য ভারতীয়দের সমস্ত অধিকার হরণ করে নেওয়া হয়। ক্ষতি পূরণ নিয়ে সমস্ত ভারতীয় বণিকরা বিতাড়িত হয়। চাকর-বাকরের কাজ করা ছাড়া তাদের আর কোন গতি থাকে না। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভালে আইন করা হয়, সেখানে প্রবেশ করতে গেলে প্রত্যেক ভারতীয়কে তিন পাউণ্ড ক'রে ট্যাক্স্ দিতে হবে। নির্দ্দিষ্ট যায়গায় ছাড়া আর কোথাও তারা ঘর তৈরী করতে পারবে না। তা' ছাড়া আরও নিয়ম ছিল, ভারতীয় কোন লোক ফুটপাথের ওপর দিয়ে হাঁটতে পাবে না। এবং কোন শ্বেতাঙ্গের ছাড়পত্র ছাড়া রাত্রে নটার পর তাদের রাস্তায় বেরোনও বারণ ছিল। এই শেষের দু'টি আইনের ফল গান্ধীজিকে ভোগ করতে হয়েছিল।

গান্ধীজিকে প্রায়ই রাত্রি নটার পরও বাইরে যেতে হ'ত। বন্ধুরা ভাবলো, পুলিশ যদি তাঁকে কোনদিন গ্রেপ্তার করে। এদিকে গান্ধীজি ছাড়পত্র গ্রহণ করা ও অপমান মনে করতেন। শেষ পর্য্যন্ত ষ্টেট্ এ্যাটর্ণির একখানি চিঠি সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরোতেন।

কিন্তু গণ্ডগোল বাধলো ফুটপাথে হাঁটা নিয়ে। গান্ধীজি প্রত্যহ প্রেসিডেন্ট ক্রুগারের বাড়ীর সামনে দিয়ে মাঠে বেড়াতে যেতেন। ফুটপাথের ওপর দিয়েই যেতেন। একদিন ক্রুগারের বাড়ীর সামনে যে প্রহরী ছিল, সে হঠাৎ ছুটে এসে কোন কথা না ব'লে এক লাথি মেরে গান্ধীজিকে ফুটপাথ থেকে

রাস্তায় ফেলে দিল। গান্ধীজি উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধূলো ঝাড়তে লাগ্‌লেন। এমন সময় তাঁর একজন ইংরেজ বন্ধু ঘোড়ায় চড়ে ঘটনাস্থলে হাজির হলেন। তিনি বল্লেন, 'গান্ধী, আমি সব দেখেছি। যদি বল ত ওর বিরুদ্ধে কোর্টে সাক্ষী দিতে রাজি আছি।' কিন্তু গান্ধীজির হৃদয়ে তখন থেকেই যথেষ্ট ক্ষমাশীলতা ছিল। তিনি শান্তভাবে বল্লেন, 'ওর দোষ কি? ও শুধু আদেশ পালন করেছে। আমি ওকে ক্ষমা করিছি।'

কিছুকালের মধ্যেই গান্ধীজির চেষ্টায় দাদা আবদুল্লার মামলাটা মিটমাট হ'য়ে গেল। এক বছর হয়ে গেছে, সুতরাং গান্ধিজী দেশে ফেরবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর বিদায় উপলক্ষে আবদুল্লা ডার্ব্বানে একটা ভোজের আয়োজন করলেন। সহরের অনেক ভারতীয়ই সেখানে উপস্থিত ছিল।

গান্ধীজি খবরের কাগজটা ওল্টাতে-ওল্টাতে হঠাৎ এক জায়গায় দেখ্‌লেন—ভারতীয়দের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করবার জন্যে শীঘ্রই একটী বিল ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হবে। গান্ধীজি বুঝিয়ে দিলেন, এই বিলটা পাশ হ'লে ভারতীয়দের দুর্দ্দশা আরও বেড়ে যাবে।

দাদা আবদুল্লা হতাশভাবে বল্লেন, 'আমরা কি করতে পারি? আমরা যে লেখাপড়া মোটেই জানি না। আইন-সংক্রান্ত সব কাজে আমাদের সাহেব-এটর্নির সাহায্য নিতে হয়।'

সভার অন্যান্য লোকেরা ব'লে উঠ্‌ল, 'আবদুল্লা শেঠ,

গান্ধীভাইকে যেতে দিও না। তিনি এখানে থেকে বলুন আমাদের কি করতে হবে। তা' হ'লে আমরা বিলটার বিরুদ্ধে লড়্তে পারবো।'

ফলে, গান্ধীজির আর দেশে ফেরা হ'ল না।

কিন্তু আফ্রিকায় থাকতে হ'লে তাঁর জীবন ধারনের একটা সংস্থান চাই ত। তাই ঠিক হ'ল, তিনি ভারতীয়দের ব্যারিষ্টার হবেন। সেখানে অনেক ভারতীয় ধনী বণিক ছিলেন, তাঁদের মামলা-মকদ্দমারও অভাব ছিল না। সুতরাং মোহন-দাসের অর্থের কোন অভাব রইল না।

প্র্যাকটিশ্ করবার অনুমতি লাভের জন্যে গান্ধীজি নেটালের সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করলেন। সে-কথা শুনে শ্বেতাঙ্গ উকিল-ব্যারিষ্টারদের মধ্যে হুলুস্থূল প'ড়ে গেল। তাঁরা সমস্বরে বল্লেন, 'একজন কুলিকে ওকালতি করতে দেওয়া যেতে পারে না। এই কুলিরা জাত হিসাবে মারাত্মক। এদের একজন যদি ব্যারিষ্টার হয় ত দেখ্তে-দেখ্তে আরো অনেকে ওকালতি করতে দৌড়ে আস্বে। তখন শ্বেতাঙ্গদের কি অবস্থা হবে?'

সুপ্রিম কোর্ট ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখলেন। সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে তাঁরা মোহনদাসকে ব্যারিষ্টারি করবার অধিকার দিলেন।

এইবার তাঁর আসল কাজ আরম্ভ হ'ল। বিলটার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঝড় তুল্তে হবে। দেখ্তে দেখ্তে অসংখ্য

স্বেচ্ছাসেবক জুটে গেল। তাদের ভেতর ছিল ধনী বণিক, গরীব কেরাণী, শিক্ষক, ছাত্র। জনসাধারণের জন্যে মিলে-মিশে কোন কাজ করা তাদের এই প্রথম। তারা স্বজাতির জন্যে কোন কাজ করতে পারে এ ধারনাই তাদের ছিল না। কিন্তু তাদের সামনে ছিল সমূহ বিপদ, আর পেছনে ছিল পঁচিশ বছরের যুবক মোহনদাসের কর্ম্ম প্রেরণা। গান্ধীজির উন্মাদনী ভাষার যাদুতে ধর্ম্ম-বিভেদ ভুলে একত্রিত হ'ল হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান, প্রাদেশিকতা ভুলে হাতে হাত মেলালো গুজরাটি-মাদ্রাজি-সিন্ধি, অর্থনৈতিক পার্থক্য ভুলে পাশাপাশি দাঁড়ালো ধনী দরিদ্র, প্রভু-ভৃত্য।

কাগজে, কাগজে বিলটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছাপানো হ'ল। গান্ধীজির পরামর্শ অনুযায়ী নেটালের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যরা বিলটীর তীব্র সমালোচনা করলেন। এমন কি শ্বেতাঙ্গরাও কেউ-কেউ ভারতীয়দের যুক্তি সমর্থন করলেন। কিন্তু তবুও বিলটী পাশ হ'ল এবং বিলেতে পাঠানো হ'ল রাজ-সম্মতির জন্যে।

গান্ধীজি ঠিক করলেন, ভারতীয়দের দাবী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কানে তুলতে হবে। ঔপনিবেশিক সেক্রেটারির কাছে পাঠাতে হবে একটা বিরাট প্রতিবাদ-পত্র।

কিন্তু হাতে সময় আছে আর মাত্র পনের দিন। তার ভেতর দশ হাজার স্বাক্ষর জোগাড় করা সম্ভব হবে কি? স্বেচ্ছাসেবকরা এগিয়ে এসে বল্লে, 'গান্ধীভাই, তুমি শুধু

একবার আমাদের হুকুম দাও। তারপর দেখ্‌বে সম্ভব হয় কি হয় না।'

সম্ভব করাও ত আর ছেলেখেলা নয়। একে সকলেই এ কাজে অনভিজ্ঞ, তার ওপর ভারতীয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকার নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গার দূরত্ব শুধু বেশী নয়, পথ অত্যন্ত দুর্গম, বিপদ-সঙ্কুল অনেক জায়গাতেই যানবাহন চলে না। কিন্তু তীব্র ইচ্ছার কাছে পাহাড়ও নত হয়, পথ হয়ে আসে অনতিদূর। দিকে দিকে দলে-দলে ছুটে চল্‌লো স্বেচ্ছাসেবকের দল দেহে—তাদের বিজয়ী যৌবন, অন্তরে নব-জাগ্রত জাতিপ্রেম। যেখানে গাড়ী চলে গাড়ীতেই আর তা' না হ'লে পায়ে হেঁটেই কাজ চল্‌লো। আর শুধু ত স্বাক্ষর সংগ্রহ নয়। গান্ধীজি স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিয়েছিলেন, স্বাক্ষরকারীকে সব কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে। কারণ এই আন্দোলন শুধু বিলটীর প্রতিবাদে নয়, ভারতীয়দের আত্ম নির্ভরতা জাগিয়ে তোলাও এর একটা লক্ষ্য।

নির্দ্দিষ্ট দিনের আগেই দশ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ হ'য়ে গেল। গান্ধীভাইয়ের আহ্বান বিফল হল না। এইবার কাগজে-কাগজে ভারতীয়দের স্বপক্ষে প্রবন্ধ লেখা হ'ল বিলেতের টাইম্‌স্ পত্রিকা স্পষ্টই ভারতীয়দের সমর্থন করলো শেষ পর্য্যন্ত, মহারাণীর সম্মতি না পাওয়ায় বিলটী তখনকার মত নাকচ হ'য়ে গেল।

গান্ধীজি বুঝিলেন, এই আন্দোলনের পরই তার প্রতিক্রিয়া

স্বরূপ আসবে জড়তা আর অলস আত্মতৃপ্তি। প্রথম-জাগা ক্ষণিকের এই উন্মাদনাকে লোকের মনে দৃঢ় করতে হবে, তাদের কর্ম্ম-প্রেরণা ক'রে তুলতে হবে স্থায়ী ও সংযত। শুধু তাই নয়, ভারতীয়দের দুরবস্থার কথা স্বদেশে প্রচার করতে হবে, আফ্রিকার সমস্ত প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে অবিরাম আন্দোলন চালাতে হবে।

তাই গান্ধীজি সৃষ্টি করলেন নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস। এই কংগ্রেস ভারতীয়দের মুখপত্র ও আন্দোলনের অস্ত্রস্বরূপ হ'ল। মুসলমান বণিকরা অকাতরে অর্থদান করলো, আর হিন্দু-পার্শী-মুসলমান-খৃষ্টান যুবকেরা তাদের অফুরন্ত উৎসাহ ও মহান ত্যাগ নিয়ে দলে-দলে কংগ্রেসের সভ্য হ'ল। যুবক মোহনদাস হলেন সেক্রেটারি।

কিন্তু যারা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী, অর্থে সবচেয়ে দীন, অত্যাচারে সবচেয়ে মূক সেই শ্রমিক মজুররা তখনো দূরে র'য়ে গেল। গান্ধীজি তাদের সঙ্গে মেশবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন সে সুযোগ জুটে গেল।

একদিন গান্ধীজি আফিসে কাজে ব্যস্ত, এমন সময় তিনি বাইরে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি ঘর থেকে বেরোতেই ছিন্ন-ভিন্ন পোষাক পরা একটী তামিল শ্রমিক মাথার পাগড়ী খুলে তাঁর সামনে দাঁড়ালো। তার সামনের দুটো দাঁত ভাঙা, মুখ দিয়ে অজস্র রক্ত ঝরছে, দু'চোখ অশ্রুপূর্ণ। তাকে দেখে গান্ধীজী চমকে উঠলেন। দু'পা

পেছিয়ে গিয়ে বেদনা-ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বল্লেন, 'এ কি! কে তোমার এই অবস্থা করেছে?' তামিল কেরাণীর সাহায্য তিনি জান্‌লেন, বলসুন্দরম্ একজন চুক্তিবন্দী, কোন কারণে ক্রুদ্ধ হ'য়ে তার শ্বেতাঙ্গ-প্রভু এই রকম জঘন্যভাবে তাকে প্রহার করছে।

প'ড়ে রইল আফিসের কাজ। গান্ধীজি বলসুন্দরম্‌কে নিয়ে ছুট্‌লেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার তার ক্ষত স্থান পরীক্ষা ক'রে আঘাতের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিলেন। তক্ষুনি সেই সার্টিফিকেট নিয়ে গান্ধীজি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির হ'লেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তা' পড়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলসুন্দরমের মনিবের বিরুদ্ধে শমন জারি করলেন।

গান্ধীজি ভেবে দেখ্‌লেন বলসুন্দরম্‌কে উদ্ধার করবার দু'টী মাত্র পথ আছে। এক,যথাযথ যায়গায় দরখাস্ত ক'রে তাকে চুক্তি-বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া; দুই, তাকে মনিবান্তর করা এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নিয়ে গান্ধীজি বলসুন্দরমের মনিবকে বল্লেন, 'তুমি বোধহয় বুঝ্‌তে পারছ, তোমার অপরাধের ফলে তোমায় জেল খাটাতে পারি? কিন্তু তোমায় শাস্তি দেবার আমার ইচ্ছে নেই। আমি চাই, তুমি ওর চুক্তিপত্র অন্য কোন মনিবের হাতে দাও।' মনিবটী রাজী হ'ল।

বলসুন্দরম্ হাসিমুখে নতুন মনিবের কাছে চ'লে গেল। যাবার সময় গান্ধীজিকে আশীর্ব্বাদ ক'রে গেল এবং তার শ্রমিক-মজুর ভাইদের ভেতর তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো।

তাদের ভেতর একটা উৎসাহের সাড়া প'ড়ে গেল। তারা বুঝ্‌লো, তাদের দুঃখে দুঃখী হবার, তাদের শোকে সান্ত্বনা দেবার, তাদের উৎপীড়নে লড়াই করবার মত একজন অন্ততঃ লোক আছে। আশান্বিত-হৃদয়ে দলে-দলে তারা গান্ধীজির আফিসে যাতায়াত সুরু করলো।

বলসুন্দরমের সংস্পর্শে আস্‌বার পর গান্ধীজি চুক্তি বন্দীদের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলেন।

আফ্রিকা কাফ্রিদের স্বদেশ, কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের জয়রথ রোখ্‌বার মত সভ্যতা বা শক্তি কোনটাই তাদের ছিল না। ফলে, ইউরোপীয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকার অধিপতি হ'য়ে দাঁড়ালো। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নেটালে ইউরোপীয়েরা দেখ্‌লো, সেখানে আকের চাষ খুব ভাল চল্‌তে পারে। কিন্তু চাষ করবে কে? কাফ্রিরা চাষ করতে জানেও না, চায়ও না। শ্বেতাঙ্গেরা রাজার জাত—তাদের পক্ষে চাষ করা দস্তুরমত অপমানকর। সুতরাং তারা ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট্‌কে অনুরোধ করলো, ভারতীয় শ্রমিক পাঠাও। আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট্ তক্ষুনি রাজী হ'য়ে গেলেন। ঠিক হ'ল, ভারতীয় শ্রমিকরা পাঁচবছরের চুক্তি সই ক'রে নেটাল যাবে। তারপর তারা সেখানেই জমিজমা নিয়ে স্বাধীনভাবে স্থায়ী বসবাস করতে পারবে। এই লোভ দেখানোয় আমাদের গরীব দেশে মজুরের অভাব হ'ল না। দলে-দলে ভারতীয় শ্রমিকরা ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের আশায় সাগর-পারে স্বেচ্ছা-দাসত্ব করতে চল্‌লো।

কিন্তু শ্বেতাঙ্গেরা ভারতীয়দের কর্ম্মকুশলতার কথা ভেবে দেখেনি। শ্রমিকেরা চাষবাসের অদ্ভুত উন্নতি সাধন করলো। নানা শাকসব্জি, ফলমূল, এমনকি আম পর্য্যন্ত তারা ফলিয়ে ফেল্‌লো। জমি কিনে তারা বড়-বড় বাড়ীঘর বানালো। তারপর আরম্ভ করলো ব্যবসা-বাণিজ্য। এইবার ভারতবর্ষ থেকে বনিকেরাও এসে উপস্থিত হ'লো।

শ্বেতাঙ্গব্যবসায়ীরা শঙ্কিত হ'য়ে পড়লো। ভারতীয় বনিক-দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তারা পেরে উঠ্‌লো না, কারণ তাদের তুলনায় ভারতীয়দের জীবন-যাত্রা প্রণালী অনেক সাদাসিধে, কম ব্যয়সাধ্য। তারা বুঝলো, খাল কেটে কুমীর আনা হয়েছে।

এই হ'লো দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের ভারতীয় বিদ্বেষের গোড়ার কথা।

বলসুন্দরমের সঙ্গে গান্ধীজির পরিচয় হবার মাস কয়েক পরেই এই চুক্তি-বন্দী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে একটী নতুন 'বিলে'র খড়্গ উদ্যত হ'ল। এই বিলটীর সর্ত্তগুলি অমানুষিক ভাবে হৃদয়হীন।

১। চুক্তির মেয়াদ ফুরোলে চুক্তি-বন্দী শ্রমিকদের দেশে ফিরে যেতে হবে।

২। কিম্বা প্রত্যেক দু'বছর অন্তর তাকে নতুন চুক্তি-আবদ্ধ হ'তে হবে। অবশ্য তার মাইনে বাড়বে।

৩। প্রথম দু'টি সর্ত্তের অন্যথায় তাকে বছরে পঁচিশ পাউণ্ড ক'রে ট্যাক্স্ দিতে হবে।

গান্ধীজির নেতৃত্বে নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস বিলটার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন চালালো। কিন্তু বিশেষ লাভ হ'ল না। শুধু এই আন্দোলনের ফলে ভারতের বড়লাট লর্ড এল্‌গিন্ উপদেশ দিলেন, পঁচিশ পাউণ্ডের বদলে তিন পাউণ্ড ট্যাক্সের ব্যবস্থা করা হোক।

এই ব্যবস্থাতেই কংগ্রেসকে তখনকার মত সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল, কারণ তার নেতা গান্ধীজি তখনো সংগ্রামের উপযুক্ত অহিংস-অস্ত্রটী আবিষ্কার করিতে পারেননি। ধীরে ধীরে সে-দিকে এগিয়ে চলছিলেন।

গান্ধীজির জীবনে চিরকালই কর্ম্মে ও ধর্ম্মে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। তাই তাঁর কর্ম্ম-জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে ধর্ম্ম-জীবনের বিবর্ত্তনও থেমে ছিল না। খৃষ্টান ধর্ম্ম-যাজকদের সংস্পর্শে নানা ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল উগ্র হ'য়ে উঠল। সমস্ত ধর্ম্মের ধর্ম্ম-পুস্তকগুলি তিনি মনোযোগ দিয়ে প'ড়ে ফেল্‌লেন। তিনি হজরৎ মহম্মদের জীবনী পড়লেন, পড়লেন পার্শীদের ধর্ম্ম-গ্রন্থ। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান বাড়তেই লাগ্‌লো। উপনিষদের মধ্যে তিনি নতুন সৌন্দর্য্যের সন্ধান পেলেন। কিন্তু তিনি দেখ্‌লেন, বাহ্যিক আচার-বিচার বাদ দিলে সমস্ত ধর্ম্মেরই মূলে আছে প্রেম, ত্যাগ ও অহিংসা।

এ ছাড়াও তিনি ঋষি টলষ্টয়ের সমস্ত গ্রন্থগুলি অত্যন্ত ভক্তিভরে পাঠ করলেন। টলষ্টয়ের অমর গল্প 'The Kingdom of God is within you' তাঁকে মুগ্ধ ক'রে দিল।

তিনি মনে-মনে টলষ্টয়কে আপন গুরুপদে বরণ ক'রে নিলেন। কিন্তু নিছক চিন্তাশীল গুরুটীর চেয়ে এই কর্ম্মী শিষ্যটীর অহিংসা ও প্রেম অনেক বেশী শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্য মনীষি রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন, 'টলষ্টয়ের কাছে সমস্তই ছিল এক সদম্ভ বিদ্রোহ—দম্ভের বিরুদ্ধে, ঘৃণা—ঘৃণার বিরুদ্ধে, উচ্ছাস—উচ্ছাসের বিরুদ্ধে। টলষ্টয়ের কাছে সকল কিছুই বলপ্রয়োগ—গান্ধীজির কাছে সকল কিছুই বলের অপ্রয়োগ।'

গান্ধীজি আফ্রিকার আসবার পর তিন বছর কেটে গেছে। এর ভেতর এক দিনের জন্যেও স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সুযোগ পাননি। ঠিক হ'ল, ছ'মাসের জন্যে তিনি স্বদেশে যাবেন এবং স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে আসবেন আফ্রিকায় বসবাসের জন্যে।

ভারতবর্ষে ফিরেই তাঁর প্রথম কাজ হ'ল দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে দেশের লোককে সজাগ ক'রে তোলা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লেখেন। প্রায় দশ হাজার কপি ছাপা হয়। প্রত্যেক কাগজে ও প্রত্যেক নেতার কাছে এক কপি ক'রে এই পুস্তিকা পাঠিয়ে দেন। তারপর ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁর বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছ'মাস কেটে গেল। গান্ধীজি সপরিবারে আবদুল্লা কোম্পানীর 'কুরল্যাণ্ড' জাহাজে ভারত ত্যাগ

করলেন। তার দু'একদিন পরে আর একখানি জাহাজও যাত্রী নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করে। পথে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ধরে জাহাজ দু'টীকে প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। তারপর দু'টী জাহাজ প্রায় এক সঙ্গেই ডার্ব্বান বন্দরের নিকট নোঙর্ ফেল্‌লো।

কিন্তু যাত্রীদের তখনই বন্দরে নাব্‌তে দেওয়া হ'ল না। বোম্বেতে তখন প্লেগ হচ্ছিল। ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে পাঁচ দিনের জন্যে কোয়ারান্টিনের হুকুম দিলেন। আসল কারণ অবশ্য তা' নয়। জাহাজে বসেই গান্ধীজি এর আসল কারণ জান্‌তে পারলেন।

ডার্ব্বানের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের মধ্যে তখন প্রচণ্ড আন্দোলন সুরু হ'য়ে গেছে। তারা বিরাট সভা ক'রে দাবী করলো, ঐ দু'জাহাজ ভারতবাসীদের ডার্ব্বানে নাব্‌তে দেওয়া চল্‌বে না। প্রথমে তারা দাদা আবদুল্লা কোংকে দেখালো ভয়, তারপর অর্থলোভ। তারা বল্‌লে, জাহাজ দু'খানি যদি ফেরৎ পাঠানো হয় ত সমস্ত ক্ষতিপূরণ করতে তারা প্রস্তুত।

শেঠ্ আবদুল করিম তখন দাদা আবদুল্লা কোম্পানির ম্যানেজিংপার্টনার। তিনি ভীতি-প্রদর্শন বা অর্থলোভ কোন কিছুতেই টল্‌লেন না। তিনি দৃঢ়স্বরে জানিয়ে দিলেন, জাহাজ যখন এসেছে, তখন যাত্রীরাও বন্দরে নিশ্চয়ই নাব্‌বে।

এইভাবে ডার্ব্বান একটী অসম যুদ্ধের ক্ষেত্র হ'য়ে উঠ্‌লো। একদিকে অসহায় মুষ্টিমেয় ভারতীয়দল ও তাদের দু'চারজন

ইংরাজ বন্ধু, আর একদিকে শ্বেতাঙ্গদল, যারা অস্ত্রে, সংখ্যায়, শিক্ষায় ও অর্থে সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। তা'ছাড়া তারা নেটাল গভর্ণমেণ্টের খোলাখুলি সাহায্য পাচ্ছিল। এটর্ণী জেনারেল হ্যারি এস্‌কম্ব শ্বেতাঙ্গদের সভায় যোগদিয়ে স্পষ্টস্বরে তাদের উত্তেজিত ক'রে তুলছিলেন।

জাহাজের যাত্রীরা শ্বেতাঙ্গ-জনতার চীৎকার শুন্‌তে পাচ্ছিল, 'তোমরা যদি ফিরে না যাও ত কামানের গোলায় তোমাদের সলিল-সমাধি ঘটাবো।' গান্ধীজি ভয়ার্ত্ত যাত্রীদের ভেতর ঘুরে ঘুরে সাহস ও সান্ত্বনা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

জনতার ক্রোধের আসল লক্ষ্য অবশ্য গান্ধীজি নিজে।

গান্ধীজি ভারতে যে প্রচার-কার্য্য চালিয়েছিলেন, রয়টারের সাংবাদিকরা তা'বিকৃত ক'রে আফ্রিকায় প্রচার করে। তারা জানিয়েছিল, 'ভারতে একখানা বই বেরিয়েছে। তা'তে লেখা হয়েছে, ভারতীয়রা নেটালে প্রহৃত ও লুণ্ঠিত হচ্ছে—পশুর মত ব্যবহার পাচ্ছে, যার প্রতীকার করতে তারা অক্ষম।' আসলে গান্ধীজি একবারের জন্যও একথা বলেনওনি, লেখেনওনি। এই মিথ্যা প্রচারের ফলে শ্বেতাঙ্গ-জনতা বন্দরে সমবেত হয়েছিল প্রতিশোধ নেবার জন্যে।

গান্ধীজির বিরুদ্ধে তাদের দু'টী অভিযোগ। (১) তিনি ভারতে নেটালের শ্বেতাঙ্গদের সম্বন্ধে মিথ্যা কুৎসা প্রচার করেছেন ; (২) সমস্ত নেটাল প্রদেশ ছেয়ে ফেলবার জন্যে তিনি দু'জাহাজ ভর্ত্তি ভারতবাসী সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

গান্ধীজি জাহাজের রেলিং ধ'রে ক্ষিপ্ত জনতার দিকে চেয়ে রইলেন। মাঝে-মাঝে তাদের হুঙ্কার বাতাসে ভেসে আস্‌ছিল— 'আমরা গান্ধীকে চাই', 'গান্ধীকে লিঞ্চ্ করবো', 'গান্ধীর রক্তে পথের ধুলো রাঙা করবো।'

জাহাজের ইংরেজ ক্যাপ্টেন গান্ধীজির পাশে এসে দাঁড়ালো। দু'জনের ইতিমধ্যে যথেষ্ট আলাপ হয়েছিল। ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করলে, 'মিঃ গান্ধী, ধরুন যদি শ্বেতাঙ্গরা তাদের ভয় দেখানো সত্যসত্যই কাজে পরিণত করে, অর্থাৎ আপনাকে যদি লিঞ্চ্ করে, তখন আপনার অহিংসা-মন্ত্রের কি অবস্থা হবে?' গান্ধীজি মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, 'আমি আশা করি, ভগবান আমায় ওদের ক্ষমা করবার মত সাহস দেবেন। ওদের ওপর আমার কোন রকম রাগ নেই।'

উত্তর শুনে ক্যাপ্টেন অবিশ্বাসের হাসি হাস্‌লেন।

প্রায় তেইশ দিন পরে জাহাজ দু'টীকে বন্দরে ভিড়তে দেওয়া হ'ল। যাত্রীরা একে একে নাব্‌তে লাগ্‌লো। মিঃ এস্‌কম্ব ব'লে পাঠিয়েছিলেন, গান্ধীজি ও তাঁর স্ত্রীপুত্ররা যেন সন্ধ্যার পর অবতরণ করেন, তা' নইলে গান্ধীজির জীবন বিপন্ন হ'তে পারে। গান্ধীজি তাতে রাজী হলেন। কিন্তু আবদুল্লাকে কোম্পানীর ব্যারিষ্টার মিঃ লটন এসে বললেন, গান্ধী তোমার যদি ভয় না করে ত, আমি বলি, তোমার স্ত্রী-পুত্ররা গাড়ী ক'রে রুস্তমজীর বাড়ী চলুন আর তুমি-আমি দু'জনে

হেঁটে যাই। তুমি যে রাত্রির অন্ধকারে চোরের মত সহরে ঢুক্‌বে এ-আমি সহ্য করতে পারবো না।'

সেইভাবেই কাজ হ'ল। স্ত্রী-পুত্রদের আগে গাড়ী ক'রে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর গান্ধীজি ও মিঃ লটন্ তীরে নাব্‌লেন। তখন জনতা অধৈর্য্য হ'য়ে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেছে। এখানে-ওখানে কয়েকজন মিলে শুধু জটলা করছে। হঠাৎ কয়েকটী শ্বেতাঙ্গ বালক গান্ধীজিকে চিন্‌তে পেরে চেঁচিয়ে উঠল 'গান্ধী' 'গান্ধী।' দেখতে দেখতে ভিড় বেড়ে উঠলো। উন্মত্ত জনতা প্রথম মিঃ লটনকে গান্ধীজির কাছ থেকে দূরে নিয়ে গেল। তারপর আরম্ভ হ'লো তাঁর অহিংসা-মন্ত্রের প্রথম ব্যবহারিক দীক্ষা। প্রথমে বৃষ্টির ধারার মত তাঁর ওপর বর্ষিত হ'ল ইঁট্-পাট্‌কেল, পচাডিম। তা'তেও সন্তুষ্ট না হ'য়ে একজন তাঁর পাগড়ী কেড়ে নিল। আর সবাই চাঁদা ক'রে তাঁর ওপর কিল-চড় লাথি-ঘুঁষি মেরে চল্‌লো। গান্ধীজি প্রায় অচৈতন্যভাবে একটা বাড়ীর সামনের রেলিং ধ'রে মুখ বুঁজে মার খেতে লাগলেন। আর কিছুক্ষণ এভাবে চললে সেদিন সে পথেই তিনি প্রাণ হারাতেন। এমন সময় সেখানে পুলিশ সুপারের স্ত্রী উপস্থিত হ'লেন। তিনি ব্যাপার দেখে ঝাঁ ক'রে ছাতা খুলে গান্ধীজিকে আড়াল ক'রে দাঁড়ালেন। জনতা একটু থতমত খেয়ে থেমে গেল। কারণ গান্ধীজিকে আঘাত করতে গেলে মিসেস্ আলেক জাণ্ডার আহত হ'তে পারে না। ইতিমধ্যে পুলিশে খবর দেওয়া

হয়েছিল। পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌ সদলবলে এসে গান্ধীজিকে উদ্ধার ক'রে রুস্তমজীর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। রক্ত লোলুপ জনতা বাড়ী ঘেরাও ক'রে চেঁচাতে লাগ্‌লো, 'আমরা গান্ধীকে চাই।'

পুলিশ সুপার দেখ্‌লেন, রাত্তির হ'য়ে আস্‌ছে, শেষ পর্য্যন্ত হয়ত উন্মত্ত জনতাকে আট্‌কে রাখা যাবে না। তিনি তাই গান্ধীজিকে বল্‌লেন, 'দেখুন, আমার মনে হয় আপনার এখন লুকিয়ে পালানো উচিত। তা' নইলে আপনার স্ত্রী-পুত্রের জীবন এবং আপনার বন্ধুর বাড়ী-ঘর বিপন্ন হবে।'

প্রথমটা গান্ধীজী রাজী হলেন না। শেষ পর্য্যন্ত ভেবে দেখ্‌লেন পুলিশ-সাহেবের কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। বন্ধুর সম্পত্তি নষ্ট করবার কোন অধিকার তাঁর নেই।

ঠিক হ'ল, তিনি ছদ্মবেশে পালাবেন। ভারতীয় কন্‌স্টে-বলের ইউনিফর্ম্‌ পরলেন। কাঁচের প্লেটে মাদ্রাজী স্কার্ফ জড়িয়ে তাঁর মাথার হেলমেট তৈরী হ'ল। কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ সেজে দু'জন ডিটেকটিভের সঙ্গে তিনি পাশের দোকানের ভেতর দিয়ে পালালেন।

পুলিশ-সুপার বাইরে তখন জনতাকে ভুলিয়ে রাখ্‌বার জন্যে তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান ধরেছেন—

Hang old Gandhi

On the sowr apple tree,

জনতা যখন শুন্‌লো তাদের শিকার হাতছাড়া হ'য়ে গেছে,

তখন প্রথমটা বিশ্বাস করেনি। তারপর বাড়ীতে ঢুকে তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজেও গান্ধিজীকে না পেয়ে তারা হতাশ হ'য়ে ফিরে গেল।

এই ঘটনার খবর পেয়ে ঔপনিবেশিক সেক্রেটরি মিঃ চেম্বারলিন নেটাল গভর্ণমেণ্টকে তার করলেন, গান্ধীর আক্রমণ কারীদের কঠোর শাস্তির বন্দোবস্ত করা হোক।

তখন এটর্নী-জেনারেল মিঃ এস্‌কম্ব গান্ধীজিকে ডেকে পাঠিয়ে খুব দুঃখ-প্রকাশ করলেন। বল্লেন, 'মিঃ গান্ধী, আপনি যদি আপমার আক্রমণকারীদের সনাক্ত করতে পারেন ত আমি তাদের গ্রেপ্তার ক'রতে প্রস্তুত আছি।'

গান্ধীজি শান্তভাবে বল্‌লেন,'আমি কিন্তু প্রস্তুত নই। জন-কয়েককে অবশ্য আমি চিন্‌তে পেরেছিলুম, কিন্তু তাদের শাস্তি দিয়ে কি লাভ হবে? সত্যি কথা বল্‌তে কি, তাদের দোষই বা কতটুকু? তারা গুজবে বিশ্বাস ক'রে প্রতিহিংসায় মেতে উঠেছিল। আর এই গুজব-রটনার ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের দায়ীত্ব সবচেয়ে বেশী। আপনাদের উচিতছিল, জনতাকে সংযত করা, কিন্তু আপনারাও রয়টারের কথা বিশ্বাস করেছিলেন। আমর মনে হয়, সত্যিকথা প্রকাশ পেলে আক্রমণকারীরা নিজেরাই নিজেদের ভুল বুঝে দুঃখিত হবে।'

মিঃ এস্‌কম্ব্‌ গান্ধীজিকে কথাগুলো লিখে দিতে বল্‌লেন। তাঁর লিখিত উত্তর যখন কাগজে ছাপা হ'ল, তখন ডার্ব্বানের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে গেল। কাগজে-

কাগজে জনতার বর্ব্বর ব্যবহারের তীব্র নিন্দা ক'রে অনেকেই আন্তরিক অনুশোচনা জানালো। এই ঘটনার ফলে ভারতীয়দের আত্ম-সম্মান জ্ঞান অনেক বেড়ে গেল। গান্ধীজির অহিংস ক্ষমাশীলতা জয়লাভ করলো।

গান্ধীজি চিরকাল অত্যাচারকে ঘৃণা করেছেন, কিন্তু অত্যাচারীকে করেছেন সেবাও ক্ষমা। দক্ষিণ-আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শত্রুভাব, কিন্তু তাদের বিপদে সাহায্য করবার জন্যে তিনি সর্ব্বাগ্রে ছুটে গেছেন।

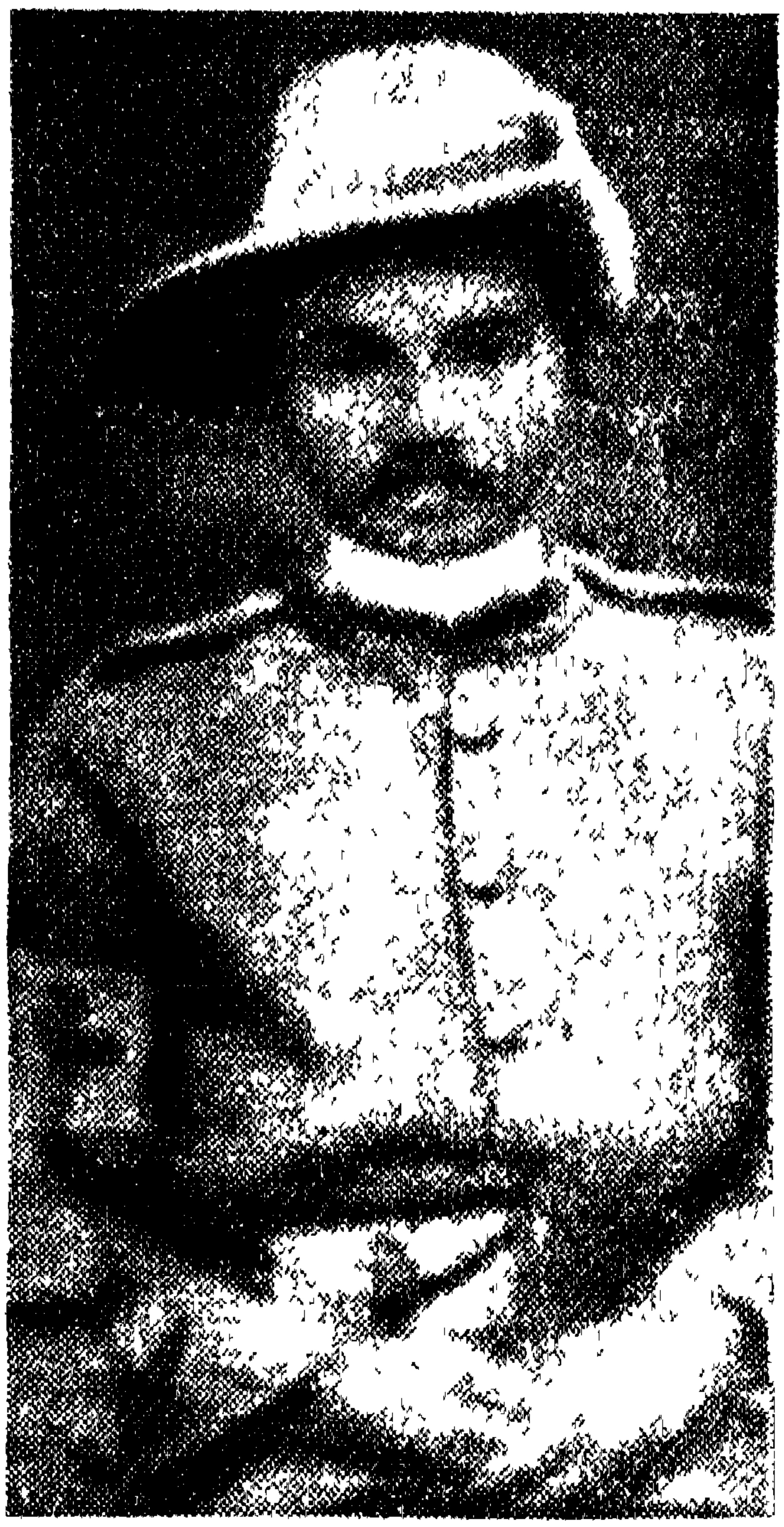

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভালের বুয়রদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে। যে সব ওলন্দাজ আফ্রিকাতেই উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তাদের বলত বুয়র। চিরকালের নিয়মমত ইংরেজরা এই বুয়র যুদ্ধে প্রথম-প্রথম ভয়ানকভাবে হেরে যেতে থাকে। বিপন্ন ইংরেজদের সাহায্য করবার জন্যে গান্ধীজি একটী ভারতীয় অ্যাম্বুলেন্স্ বাহিনী গঠন

করেন। এতে প্রায় এগারোশ'জন কর্ম্মী ছিল। প্রথমে গভর্ণমেণ্ট্ এই অ্যাম্বুলেন্স্ বাহিনীকে যুদ্ধে যেতে দিতে রাজী হয় না। ইংরেজরা হো-হো ক'রে হেসে টিট্‌কিরি দিল, 'কাপুরুষ কালা আদ্‌মিরা যাবে যুদ্ধে সেবা করতে?' কিন্তু এ-হাসি বেশীদিন রইল না। স্পিয়ন্‌কপের যুদ্ধে যখন ইংরেজরা ক্রমাগত হেরে যাচ্ছে, তখন ভারতীয় অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীর ডাক পড়লো। গান্ধীজির নেতৃত্বে এই বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে গোলা-গুলি বর্ষণের মধ্যে গিয়ে আহতদের শুশ্রূষা করতে লাগলো। ভারতীয়দের সাহস ও আত্মত্যাগ দেখে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেল।

আর একবার জুলু-বিদ্রোহের সময়ও গান্ধীজি এই রকম একটী বাহিনী গঠন করেন।

গান্ধীজি দেখলেন, আফ্রিকায় আপাততঃ তাঁর কোন রাজনৈতিক কাজ নেই। একমাত্র কাজ অর্থ-উপার্জ্জন। এই সময় তিনি মাসে প্রায় চার-পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করতেন। তাঁর ভয় হ'ল, আর বেশীদিন এখানে থাক্‌লে তাঁর জীবনের কাম্য হ'য়ে দাঁড়াবে। তাই সপরিবারে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। উদ্দেশ্য, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে দেশের সেবা করবেন।

কিন্তু স্থায়ীভাবে দেশে বেশিদিন বাস করা তাঁর ভাগ্যে তখন ছিল না।

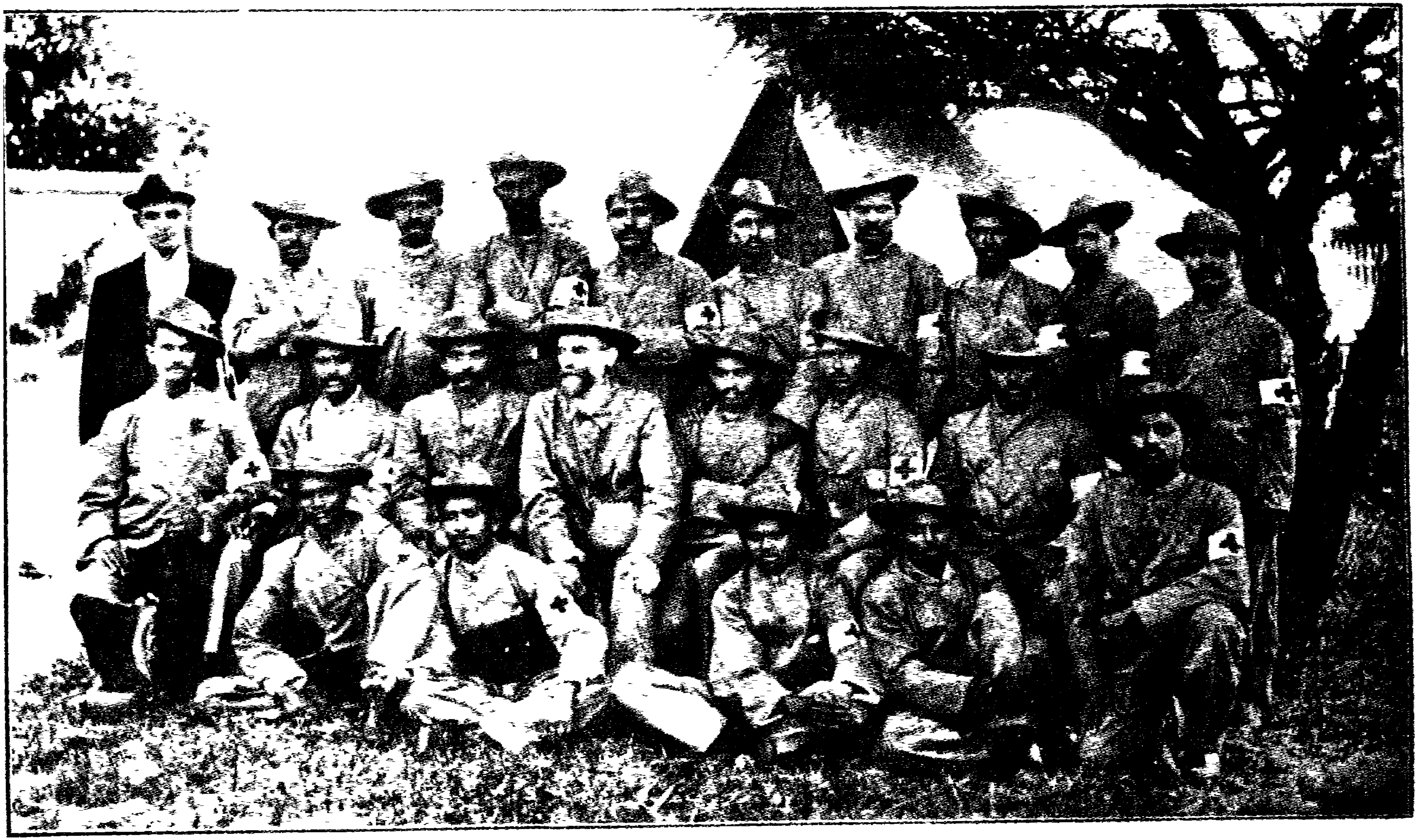

নিয়তি তখন সাগর-পারে তাঁর জন্যে জয়ের মালা গাঁথছেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আবার আফ্রিকা থেকে তাঁর ডাক এলো।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন—দক্ষিণ আফ্রিকায়।

ঔপনিবেশিক সেক্রেটারী মিঃ চেম্বারলেন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এলেন।

ইংরেজদের ন্যায়-বিচার ও সহৃদয়তার প্রতি গান্ধীজির তখনো পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল। ঠিক হ'ল, ভারতীয়গণের পক্ষ থেকে মিঃ চেম্বারলেনের কাছে একটী আবেদন পেশ করা হবে। নেটালের ভারতীয়গণ গান্ধীজিকেই তাদের মুখপাত্র করলো। করুণ অথচ সংযত ভাষায় ভারতীয়গণের দুঃখ-দুর্দ্দশা বর্ণনা ক'রে গান্ধীজি একখানি পত্র লিখে ফেল্লেন। ভারতীয় ডেপুটেশানের নেতা হ'য়ে তিনি মিঃ চেম্বারলেনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

কিন্তু চেম্বারলেন আফ্রিকায় এসেছেন প্রচুর অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে। তাঁর আসল কাজ মিষ্টিকথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে তোয়াজ ক'রে দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র ও ইংরেজদের কাছে সাড়ে তিন কোটি পাউণ্ড অর্থ ভেট নেওয়া। কাঁদুনী শোনবার তাঁর সময়ই বা কোথায়, ইচ্ছেই বা কোথায়? একদিকে ভারতীয়দের দুঃখ-কষ্ট, অন্যদিকে সাড়ে তিন কোটি

পাউণ্ড—দাঁড়িপাল্লা যে শেষের দিকে হেল্‌বে তা'তে আর বিচিত্র কি! ইংরেজরা ব্যবসাদারের জাত—মানবতার চেয়ে অর্থের দাম তাদের কাছে বেশী।

এই চেম্বারলেন অমায়িকভাবে বল্লেন, তা 'আপনারা জানেনই ত' উপনিবেশগুলির ওপর ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের বিশেষ হাত নেই। আপনাদের দুর্দ্দশা অবশ্য আমি বুঝ্‌তে পারছি। আমার যতটুকু সাধ্য তা' করবো। কিন্তু আপনাদের একটা কথা না ব'লে থাক্‌তে পারছি না। আপনাদের যখন দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গেই থাক্‌তে হবে, তখন তাদের খানিকটা খোসামোদ আপনাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না কি?'

এই কথা শুনে গান্ধীজি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হলেন। তাঁর মনে হ'ল, চেম্বারলেন যেন ভদ্র ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন — জোর যার মুল্লুক তার।

এদিকে ট্রান্সভালের ভারতীয়রাও গান্ধীজিকেই ডেপুটেশানের অধিনায়ক করতে চাইলো। অবশ্য তিনি বুঝেছিলেন, এর ফল কিছুই হবে না: কিন্তু পাছে আবেদন না পাঠালে পরে শ্বেতাঙ্গরা বলে যে ট্রান্সভালের ভারতীয়দের সতি-সত্যিই কোন দুঃখ কষ্ট নেই, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হলেন। কিন্তু এবারে বাধা হ'য়ে দাঁড়ালো এশিয়াটিক্ ডিপার্টমেণ্ট।

বুয়র যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ ও সিংহল থেকে অনেক

ইংরেজ অফিসার আফ্রিকায় এসেছিলেন। যুদ্ধের শেষে তাদের চাকরী দেবার জন্যে সদাশয় গভর্ণমেণ্ট এই ডিপার্টমেণ্টটী প্রতিষ্ঠা করেন। এই ডিপার্টমেণ্টের কাজ হ'ল, দক্ষিণ আফ্রিকার এশিয়া বাসীদের সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা। শ্বেতাঙ্গরা কালা আদমিদের প্রতি কি রকম লক্ষ্য রাখ্‌বেন, সহজেই অনুমান করা যায়। লক্ষ্য তাঁরা রাখছিলেন নিজেদের ঘুষের পরিমাণ বাড়ানোর দিকে। এ হেন মহাত্মাদের সর্দ্দার বেঁকে বস্‌লেন।

ট্রান্সভালের গণ্যমান্য ভারতীয়দের ডেকে তিনি বল্লেন, 'ওহে, এই গান্ধী লোকটা কে?' জনৈক ভারতীয় বল্লেন, 'তিনি আমাদের নেতা। আমাদেরই অনুরোধে ভারত থেকে এসেছেন'।

অফিসারটী রুক্ষস্বরে বল্লেন, 'তবে তিনি ভারতেই ফিরে যান। তোমাদের দেখ্‌বার জন্যে ত আমরা রইছি, তিনি আবার মাতব্বরী করতে আসেন কেন? চেম্বারলেনের কাছে ডেপুটেশান পাঠাতে চাও পাঠাও, কিন্তু ঐ বিদেশী গান্ধীটাকে বাদ দিতে হবে।'

প্রথমটা ভারতীয়রা এ-কথায় রাজী হ'ল না। শেষে গান্ধীজি অনেক বুঝিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করলেন।

চেম্বারলেন এলেন, শুন্‌লেন, চ'লে গেলেন। ভারতীয়রা ভোট দেবার অধিকারও ফিরে পেল না, সাংবাৎসরিক তিন পাউণ্ড কর দেওয়াও বন্ধ হ'ল না। কিন্তু ভারতীয়দের দুর্দ্দশায় তখনো অনেক বাকী ছিল।

শ্বেতাঙ্গদের শয়তানী প্রকাশ পেল আর একটা নতুন আইনে। নাম তার অত্যন্ত ভদ্র ও সুমিষ্ট—Peace Preservation Ordinance অর্থাৎ "শান্তিরক্ষা আইন"। এই আইনটী বুয়রযুদ্ধে ভারতীয়দের নিঃস্বার্থ-সেবার পুরস্কার। কালা আদমিদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের কৃতজ্ঞতা এইরকম জঘন্য-রূপেই দেখা দেয়। যেন ভারতীয়দের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হ'ল ইংরেজদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক—সেখানে কৃতজ্ঞতার প্রশ্নই ওঠে না।

অবশ্য এই আইনটী বুয়র যুদ্ধের পরই ট্রান্সভালে প্রবর্ত্তিত হয়। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এটা প্রয়োগ করা হ'ত। কিন্তু এখন একটু-আধটু অদল-বদল ক'রে শুধু ভারতীয়দের বিরুদ্ধেই এই আইনটী নতুন ভাবে লাগানো হ'ল।

এই আইনে ট্রান্সভালের সমস্ত ভারতীয়দের চোর-ছ্যাঁচোড়ের শ্রেণীভুক্ত করা হল। ঠিক হ'ল, প্রত্যেক ভারতীয়কে —কোটিপতি বণিক থেকে সাধারণ কুলি পর্য্যন্ত প্রত্যেককে সরকারী আফিসে গিয়ে রেজেষ্ট্রী করতে হবে। রেজেষ্ট্রি করাবার নিয়মটী ও চমৎকার। সাধারণ চোর-ডাকাতদের মত দু'হাতের দশ আঙুলে টিপসই দিতে হবে এবং সনাক্ত করবার জন্যে এক-জন সাক্ষী সঙ্গে থাক্‌বে। এই নিয়ম মান্‌লে তবেই ট্রান্সভালে বাস করবার অনুমতি পত্র পাওয়া যাবে। যার এই অনুমতি পত্র থাকবে না, তাকে সরকার টান্সভাল প্রদেশ থেকে বার ক'রে দেবে। ট্রান্সভালে বাস করবার জন্যে যারা আস্‌ছে

শুধু তাদের জন্যেই এই রেজেষ্ট্রির নিয়ম নয়, যারা সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা সে সব ভারতীয় ও এই নিয়মের হাত থেকে রেহাই পাবে না। এই আইন অমান্য করলে তিন রকম শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে—নির্ব্বাসন, কয়েক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও বেশ মোটা রকমের জরিমানা। ট্রান্সভাল সরকার এই আইনের কারণ দেখালো, অনেক ভারতীয় লুকিয়ে তাদের রাজ্যে প্রবেশ করছে।

ভারতীয়গণ যুক্তি দিয়ে মানবতার দোহাই দিয়ে আইনটীর বিরুদ্ধে আপত্তি জানালো। ফল কিছুই হ'ল না। আর দু'টী আইনের মত এ আইনটীও দক্ষিণ-আফ্রিকার লেজিস্-নেটিভ্ কাউন্সিলে পাশ হ'য়ে গেল। তারপর বিলটী বিলাতে পাঠানো হ'ল পার্লামেণ্ট্ ও রাজার অনুমতির জন্যে

তার এক সপ্তাহ পরে ১১ই সেপ্টেম্বর রেজেষ্ট্রি-আইনের প্রতিবাদ দিবস পালন করা হ'ল। জোহান্নেস্‌বার্গে ওল্ড্ এম্পায়ার থিয়েটারে ভারতীয়গণ এক বিরাট সভার আয়োজন করলেন। সহরের প্রায় সমস্ত বয়স্ক ভারতীয়গণই সেই সভায় যোগ দিলেন। সভাপতি হলেন শেঠ্ আবদুল গণি। তিনি ওজস্বিনি ভাষায় সকলকে আহ্বান ক'রে বল্লেন, 'আফ্রিকা যদি আমাদের কাছে বিদেশ হয়, ইংরেজদের কাছেও তাই। ইংরেজরা গায়ের জোরে যা' খুসী তাই করবে, এ আর আমরা সহ্য করতে রাজী নই। রেজেষ্ট্রি করার অপমানের চেয়ে

জেলে যাওয়া অনেক ভালো। গান্ধীভাই আমাদের পাশেই আছেন—আমাদের নেতার অভাব হবে না।'

তারপর গান্ধীজি উঠে দাঁড়ালেন। স্বভাব-সংযত স্বরে স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে ব'লে গেলেন 'শেঠজী, বলেছেন আমাদের গায়ের জোর নেই। কথাটা সত্যি। শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় আমাদের গায়ের জোর এবং অস্ত্রের জোর অনেক কম। কিন্তু আত্মাব জোরে আমরা তাদের তুলনায় হেয় নই। আমাদের অস্ত্রের অভাব আমবা আত্মবলে পূরণ কববো। তোমরা অমৃতের সন্তান, আমি জানি তোমাদের সত্যকারের শক্তি কত।'

আবদুল গণির বক্তৃতায় লোকের মনে জেগেছিল ক্ষণিকের উন্মাদনা কিন্তু গান্ধীভাই তাদের মনে এনে দিলেন স্থায়ী ও সুদৃঢ় সংকল্প। গান্ধীজির চেষ্টায় সেই সভায় ঠিক হ'ল, বিলেতে দু'জন প্রতিনিধি পাঠানো হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে গান্ধীজি ও আবদুল গণি বিলাতে যাত্রা

করলেন। সেখানে তাঁদের চেষ্টা কার্য্য করী হ'ল। আইনটী তখনকার মত বন্ধ রইল।

গান্ধীজি বুঝ্লেন এই বিরাম ক্ষণস্থায়ী। শ্বেতাঙ্গরা অত সহজে হার মানে না তারা শুধু সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করবে। আগামী সেই দুর্দ্দিনে যা'তে ভারতবাসীরা অপ্রস্তুত না থাকে, সে জন্যে তাদের অন্তরে সংগ্রামেব শিখা জ্বালিয়ে বাখা দরকার। তিনি ঠিক করলেন. একটি সংবাদ-পত্র না হ'লে এ কাজ চল্‌বে না।

প্রাণপণ চেষ্টায় গান্ধীজি 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামে একখানি খবরেব কাগজ বাব ক'বে ফেল্লেন। ভাবতীয় যুবক-গণ অপরিসীম উৎসাহ ও পরিশ্রমের সঙ্গে তাঁকে সাহায্য করলো। ছাপানোর কাজ তাঁরা নিজেরাই শিখে নিয়েছিলেন। অবসর সময়ে গান্ধীজি কম্‌পোজ করা শিখ্‌তেন। প্রত্যেকটী লেখার ভিতর দিয়ে তিনি ভাবতীয়দের অভাব-বোধ এবং সংগ্রামের উপযোগী মনোবল সজাগ বাখতে চেষ্টা করলেন।

শীঘ্রই এই 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা গেল।

কিছুদিনের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্র ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করলো। এখন আর তাদের কোন কাজের জন্যে ইংলণ্ডের অনুমতি ভিক্ষা করতে হবে না। সরকার নতুন উৎসাহে ভারতীয়দের ওপর অত্যাচার আরম্ভ করলো।

এশিয়াটিক্‌ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট্‌ অর্ডিনান্স—অর্থাৎ পিস্‌-প্রিজারভেশন্‌ অর্ডিনান্সের নতুন নাম আইনে পরিণত হ'ল।

তরবারির আইন ঝল্‌সে উঠ্‌লো, কিন্তু এবারে গান্ধীজি আর আবেদন-নিবেদনের ধার দিয়েও গেলেন না। তিনি সংগ্রামের পথ খুঁজে পেয়েছেন।

তরবারির বিরুদ্ধে সুরু হ'ল ফুলের মালার জয় যাত্রা।

গান্ধীজির নেতৃত্বে তিন হাজার ভারতীয় জোহান্নেস্‌বার্গের প্রকাশ্য সভায় ভগবানকে সাক্ষী ক'রে শপথ করলো, অহিংস উপায়ে আমরা আইনটীর প্রতিরোধ করবো।

তারা একসঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ব'লে উঠল:

ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল রব',
বক্ষে আমার দুঃখে বাজে
তোমার জয়ডঙ্ক,
দোব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ।

অহিংসা প্রতিরোধের দীক্ষা হ'ল জোহান্নেস্‌ বার্গ সহরেই।

অর্ডিনান্স জারী করবার পর গভর্ণমেণ্ট্‌ একটুও সময় নষ্ট করলো না। সহরে সহরে রেজেষ্ট্রি অফিস প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেল। একজন সাহেব কর্ম্মচারী ভারতীয়দের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে রেজেষ্ট্রি করাবেন, ঠিক হ'ল।

সাহেব কর্ম্মচারীর সঙ্গে চল্‌লো জনকয়েক পুলিশ কন্‌ষ্টেবল।

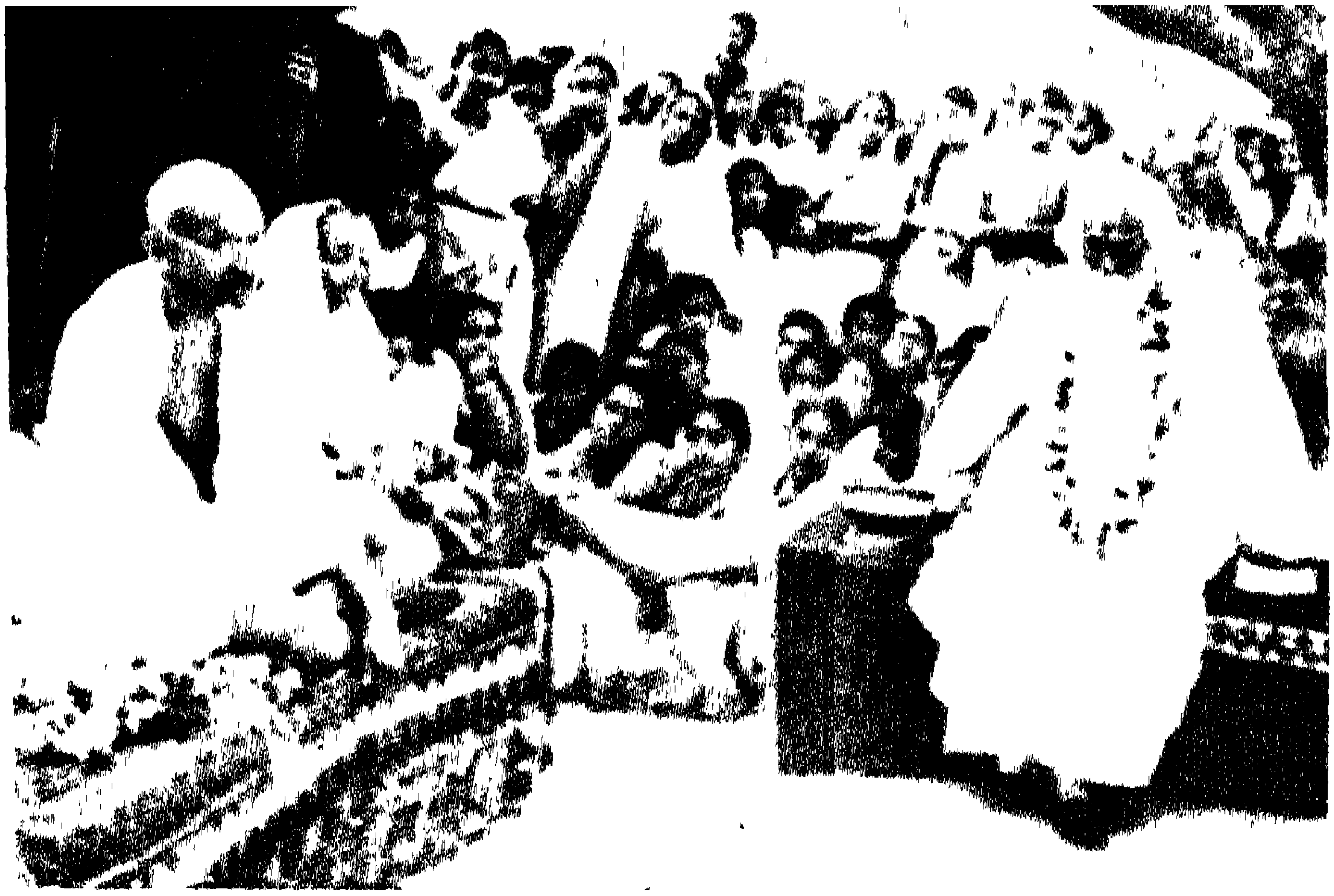

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি ও কস্তুরবাঈ

শান্তিনিকেতনের প্রতি গান্ধীজির প্রশংসায় রবীন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন (১৯১৪)

১৯১৩ সালে ট্রান্সভাল অভিমুখে সত্যাগ্রহী দল

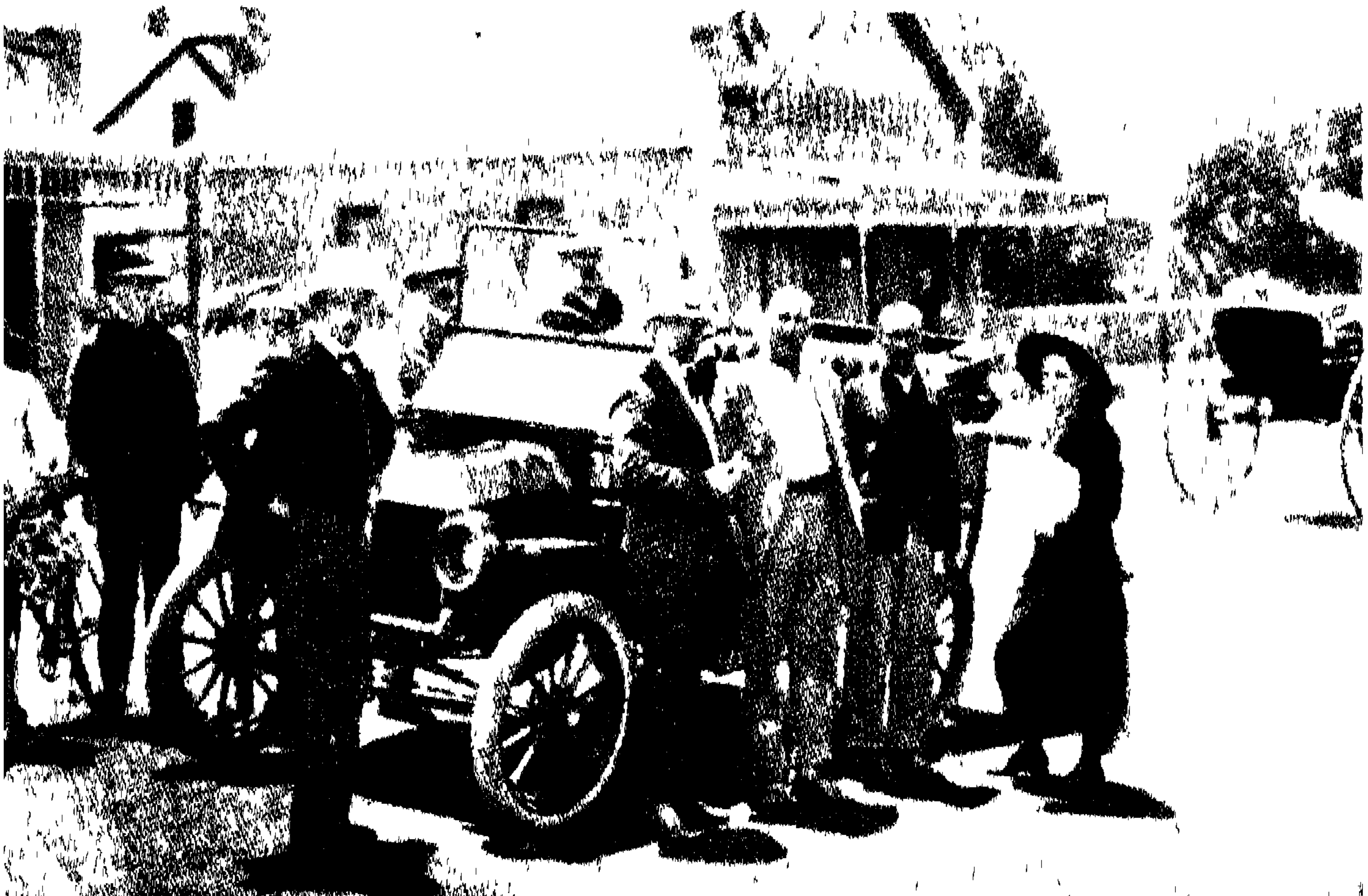

১৯১৩ সালে সত্যাগ্রহ উপলক্ষ্যে গান্ধীজি গ্রেপ্তার

সাহেব আগেই শুনেছিল, ভারতীয়েরা প্রতিরোধ করবে, তাই এই সাবধানতা। সাহেব ভেবেছিল, তাকে আসতে দেখে রেজেষ্ট্রি এড়াবার জন্যে ভারতীয়েরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে। কিন্তু তাদের প্রত্যেককেই বাড়ী থাক্‌তে দেখে সাহেব একটু থতমত খেয়ে গেল।

সাহেব ধমক দিয়ে বল্‌লে, 'রেজেষ্ট্রি না করার মানে আইন অমান্য তা' জানো ?'

একজন ভারতীয় উত্তর দিল, 'জানি বই কি, সাহেব। তবে তোমাদের আইনের চেয়ে আমাদের সম্মানের আইন—গান্ধী ভাইয়ের আদেশের আইন অনেক বড়।'

সাহেব ক্রুদ্ধ হ'য়ে বল্‌লে, 'আমাদের আদেশের চেয়ে গান্ধীর আদেশ বড় হ'ল ?'

'তা' হ'ল, সাহেব। তোমাদের আদেশের পেছনে আছে অস্ত্রের জোর, গান্ধীভাইয়ের আদেশের পেছনে আছে অসীম স্নেহ।'

সাহেব বাধা দিয়ে বল্‌লে, 'থাক্, আর বক্তৃতা দিতে হবে না। তুমি রেজেষ্ট্রি করবে কি না ?'

ভারতীয়টী হাসিমুখে শান্তভাবে উত্তর দিলে, 'না'।

সাহেবের ইঙ্গিতে কন্‌ষ্টেবলের হাতের ব্যাটন্ নেচে উঠলো। ভারতীয়টীর গাল বেয়ে টাট্‌কা রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো, কিন্তু তবুও তার মুখে সেই 'না'। বার বার আঘাত খেয়ে সে মাটীতে লুটিয়ে পড়লো, তবু রেজেষ্ট্রি করতে রাজী হ'ল না।

সাহেব বেগতিক দেখে তাকে গ্রেপ্তার ক'রে থানায় নিয়ে গেল।

সহরের সর্ব্বত্রই সেদিন এই একই ঘটনার পুণরাবৃত্তি হ'ল। বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার হ'ল, কিন্তু একজনকে দিয়েও রেজেষ্ট্রি করানো গেল না।

গভর্ণমেণ্টের এই কঠোর ব্যবহারের একটা গূঢ় কারণ ছিল। তারা ভেবেছিল, এইভাবে আঘাত দিয়ে ভারতীয়দের হিংসা জাগিয়ে তোলা যাবে। তারা হিংসার পূজারী, হিংসাকে কি ভাবে দমন করা যায় তা' তারা ভাল-ভাবেই জানে। কিন্তু অহিংসা তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের জনিষ—তারা না জানে এর রীতি-নীতি, না জানে এর প্রতিক্রিয়া। ভারতীয়দের অহিংসার সামনে তারা নিজেদের অসহায় ভাবতে লাগ্‌লো।

কিন্তু দমন-নীতির ফল কিছুই হ'ল না। ভারতীয়েরা মুখ বুঁজে মার খেয়ে গেল, হাসিমুখে কারাবরণ করলো, কিন্তু কেউ আঘাত দিয়ে পুলিশের ওপর শোধ নিতে গেল না। গান্ধীভাইয়ের আদেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে মেনে গেল।

গভর্ণমেণ্ট ভাব্‌লো, নেতাদের সামনে থেকে সরিয়ে দিলেই হয়ত ভারতীয়েরা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে। তাদের দলবদ্ধতা নষ্ট হ'য়ে যাবে, তারা মনের জোর হারিয়ে ফেল্‌বে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে পুলিশ গান্ধীজি এবং আরও দু'শ জনকে গ্রেপ্তার

ক'রে জেলে পাঠালো। গান্ধীজির শাস্তি হ'ল দু'মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

নেতাদের অভাবে জনতা বিপর্যস্ত ত হ'লই না বরং দেখা গেল, তাদের সাহস সহিষ্ণুতা ও আত্মবল যেন আরও বেড়ে গেছে। গান্ধীভাইয়েব শাস্তি দেখে প্রত্যেকে দৃঢ় সঙ্কল্প করলো রেজেষ্ট্রি করবে না। তাদের জেলে পাঠাবার জন্যে সরকাবকে তারা সাদর আমন্ত্রণ জানালো। কিন্তু এত লোককে ঠাঁই দেবার মত অত জেল কোথায় ?

দক্ষিণ আফ্রিকার শেতাঙ্গবা ভারতীয়দের এই অভিনব সংগ্রামেব দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে বইল। সাধারণ বস্তু-তান্ত্রিক দৃষ্টি দিয়ে তাবা ব্যাপারটা মোটেই বুঝতে পারলো না। তাই ভারতীয়দের কাপুরুষ ব'লে গালি দিতে লাগ্‌ল।

তাবা বল্‌লে, 'ইণ্ডিয়ানেরা বোকা তা' জানতুম, কিন্তু এতখানি বোকা তা' ধারণা ছিল না। প'ড়ে প'ড়ে মুখ বুঁজে মার খাওয়ার ভেতর বীরত্ব কোথায় ?'

বীরত্ব কোথায় তা শীঘ্রই টের পাওয়া গেল।

তখন উপনিবেশগুলির সেক্রেটারি-জেনারেল স্মাট্‌স্‌। তিনি তাঁর দমন-নীতির ফল দেখে প্রমাদ গণলেন। সমস্ত ভারতীয়দের জেলে পুরলেও ত আর সাদা চামড়ার প্রেস্‌টিজ বজায় থাক্‌বে না। তাই কার্টরাইট নামে একজন সাংবাদিকের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে তিনি গান্ধীজির সঙ্গে মিট্‌মাটের চেষ্টা করলেন।

গান্ধীজি সত্যাগ্রহী। অপোষ করা সত্যাগ্রহীর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় গুণ। তিনি দেখ্‌লেন, রাষ্ট্র সতি-সত্যিই বিপন্ন। তা' ছাড়া নিছক্ কারাবরণ ক'রে ত আর আইনটাকে রদ করা যাবে না। তিনি জেল থেকেই কার্ট্‌রাইটের মারফৎ স্মাট্‌সকে জানালেন, সরকার যদি আপোষ করতে ইচ্ছা করেন ত ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় রেজেষ্ট্রি করাতে রাজী আছে।

আর আত্মগোপনের প্রয়োজন হ'ল না। স্মাট্‌সের আমন্ত্রণে সাধারণ কয়েদির পোষাকে প্রিজন্‌ ভ্যানে ক'রে গান্ধীজি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। নমস্কার বিনিময়ের পর গান্ধীজি অনুরোধ করলেন, 'জেনারেল স্মাট্‌স্‌, আপনি আইনটা রহিত করুন।'

স্মাট্‌স্‌ বললেন, 'আচ্ছা, আমি রাজী। কিন্তু মিঃ গান্ধী, একটী সর্ত্ত আছে।'

'কি সর্ত্ত বলুন?'

'সর্ত্ত হচ্ছে, তিনমাসের ভেতর স্বেচ্ছায় সমস্ত ভারতীয় নাম রেজেষ্ট্রি করাবে।'

এই মৌখিক চুক্তির ফলে গান্ধীজি এবং অন্যান্য সকলে জেল থেকে ছাড়া পেলেন। শত্রুর সঙ্গে রফা হ'লেও ভক্ত-মিত্রের দল তাঁকে অত সহজে ছেড়ে দিল না। সত্যাগ্রহীর জীবনে এ একটা অতি সাধারণ ব্যাপার। খাঁটী সত্যাগ্রহীকে নিজের দলের হাতেও অনেক বিগ্রহ সহ্য করতে হয়। গান্ধীজি তার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন।

ভারতীয়দের মধ্যে একদল চরমপন্থী ছিল। তারা স্মাট্‌সের সঙ্গে গান্ধীজির সন্ধি-সর্ত্ত মেনে নিতে রাজী হ'ল না। তাদের চোখে নিছক সংগ্রাম করাই যেন সংগ্রামের উদ্দেশ্য। তারা ভাব্‌লো, স্বেচ্ছা-রেজেষ্ট্রি আর বাধ্যতামূলক রেজেষ্ট্রি একই জিনিষ। তারা হৈ-হৈ ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, 'গান্ধীভাই বিশ্বাসঘাতক। গান্ধীভাই সরকারের কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছে। গান্ধীজিকে নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বাসহানির জন্য কঠোর শাস্তি দেবার আয়োজন হ'ল।

একদিন একটী সভায় বক্তৃতা দিয়ে গান্ধীজি পথে বেরিয়েছেন। সঙ্গে তাঁর জনৈক ইউরোপীয় বন্ধু। এমন সময় অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা লোক সামনে এসে দাঁড়ালো— হাতে তার একখানি দীর্ঘ উজ্জ্বল ছোরা। অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের মত তার চোখদুটো জ্বল্‌ছে। উদ্যত ছোরা হাতে ক'রে গান্ধীজির দিকে এগোতে গিয়ে হঠাৎ সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লো। গান্ধীজির শান্ত নির্ভীক চোখের দৃষ্টির সামনে তার চোখের ভাব আস্তে-আস্তে স্বাভাবিক হ'য়ে এল। ছোরাখানা গান্ধীজির হাতে তুলে দিয়ে সে দ্রুতপায়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

ইউরোপীয় বন্ধুটী প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার, মিঃ গান্ধী? আপনার হাতে ছোরা কেন?'

গান্ধীজি ছোরাটাকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখ্‌তে-দেখ্‌তে হেসে বল্লেন, 'লোকটা কিছুক্ষণের জন্য পাগল হ'য়ে গেছ্‌ল।

তা'নইলে আমায় খুন করতে আসে ? বেচারা ভেবেছিল, আমি বুঝি ভারতীয়দের সর্ব্বনাশ করিছি।'

আর একদিন কিন্তু গান্ধীজি স্বজাতির হিংসার হাত থেকে রক্ষা পেলেন না।

সেদিন তিনি দু'জন সঙ্গীর সঙ্গে রেজেষ্ট্রি আফিসে যাচ্ছিলেন। আটজন পাঠান মোটালাঠি আর লোহার ডাণ্ডা হাতে নিয়ে তাঁদের পথরোধ ক'রে এগিয়ে এল। তারপর কোন কথা বল্‌তে না দিয়ে তাদের সুদীর্ঘ সবল দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে নির্দ্দয়ভাবে ক্ষীণকায় গান্ধীজিকে প্রহার করতে লাগ্‌লো। রক্তাক্ত দেহে অচেতন অবস্থায় গান্ধীজি পথের ধূলোয় প'ড়ে গেলেন। কিন্তু তবুও আততায়ীদের রাগ কম্‌লো না। তারা উন্মত্তভাবে গান্ধীজির অচেতন দেহের ওপরই অনবরত আঘাত হেনে চল্‌লো। তারপর তাঁকে মৃত ভেবে সেখানে ফেলে রেখে পাঠানের দল চ'লে গেল।

কাছেই একজন খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকের বাড়ী ছিল। মৃতপ্রায় গান্ধীজিকে তিনি নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করেন। জ্ঞান ফিরে আস্‌বার পর চোখ মেলেই গান্ধীজি যা' বল্‌লেন, তা' শুনে সকলে চমৎকৃত হ'য়ে গেল। তিনি ক্ষীণস্বরে বল্লেন, 'আমি এক্ষুণি এখানে রেজেষ্ট্রি করাতে চাই। তার ব্যবস্থা করুন। হ্যাঁ, ভাল কথা, পুলিশে খবর দেবেন না। আমি চাইনা, ওরা শাস্তি পাক্। সত্যি সত্যি ওদের কোন দোষ নেই। যা সত্যি ব'লে ভেবেছে, তাই করেছে।'

ধর্ম্মযাজক প্রশ্ন করলেন, ‘আপনার কি কোন কষ্ট হচ্ছে ?’

গান্ধীজি ম্লান হাসি হেসে বল্‌লেন, ‘এখন কোন কথা নয়, আগে রেজেষ্ট্রি হোক্।’

যাই হোক্, ভারতীয়গণ তাঁর কথাই মেনে নিল। একে একে প্রায় সকলেই স্বেচ্ছায় গিয়ে রেজেষ্ট্রি করিয়ে এল।

সন্ধির পর তিনমাস কেটে গেল। কিন্তু আইন রহিত হ’ল কোথায় ? স্মাট্‌সের কাছ থেকে আর কোন রকম সাড়া-শব্দই পাওয়া গেল না।

গান্ধীজি বল্‌লেন, ‘স্মাট্‌স্, আপনি কি প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেলেন ?’

কিন্তু স্মাট্‌স্ শ্বেতাঙ্গ। স্মাট্‌স্ মিথ্যাবাদী। স্মাট্‌স্ নির্লজ্জ।

স্মাট্‌স্ ব্যঙ্গ-হাসির সঙ্গে বল্লেন, ‘প্রতিশ্রুতি ? আমি কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম নাকি ? মিঃ গান্ধী, আপনাকে আমি সত্যের পূজারী ব’লেই জানতুম। আপনি কি রাজনীতির খাতিরে মিথ্যের বেসাতি সুরু করেছেন ? আমরা কি দুঃখে আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিতে যাব ?’

আবার আগুন জ্ব’লে উঠ্‌ল। সত্যি সত্যিই আগুন জ্ব’লে উঠ্‌লো।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট গান্ধীজির হুকুমে জোহান্নেস্‌বার্গের প্রকাশ্য-সভায় দু’হাজার লোক তাদের ডোমিসাইল সার্টিফিকেটে আগুন জ্বালিয়ে দিল। আর সেই

আগুনের শিখার তালে তালে ভারতীয়দের মনে উৎসাহের দুর্ব্বার বন্যা জেগে উঠ্ল।

গান্ধীজি বল্লেন, 'যাদের রেজেষ্ট্রি করা হয়নি, তারা আইন অমান্য ক'রে বিনা লাইসেন্সে ব্যবসা সুরু কর। ভয় পেও না, সাহস হারিও না। মনে রেখো, সত্য আমাদের দিকে, ন্যায় আমাদের দিকে।'

চল্লো রাষ্ট্রের ও হিংস্র শ্বেতাঙ্গ জনসাধারণের বর্ব্বর শক্তির বিরুদ্ধে বিবেকের যুগান্তকারী সংগ্রাম। দক্ষিণ আফ্রিকার চীনারাও এই সংগ্রামে ভারতীয়দের পাশে এসে দাঁড়ালো। কারণ এই আইনটী শুধু ভারতীয়দের বিরুদ্ধে নয়—সমস্ত এশিয়াবাসীব বিরুদ্ধে।

দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট্ এবারে যেন ক্ষেপে গেল। প্রথম থেকেই সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড নির্য্যাতন চল্লো। সহস্র সহস্র লোক কারারুদ্ধ হ'ল। প্রচুর জরিমানা দেবার শাস্তি হ'ল। শুধু তাই নয়, খনি-এলাকায় শ্রমিক-সত্যাগ্রহীদের বেত্রাঘাত করা হ'ল। নিরস্ত্র কুলি-মজুরদের লক্ষ্য ক'রে শ্বেতাঙ্গের হাতের রাইফেল্ গর্জ্জে উঠ্লো।

এবার গান্ধীজির ওপর আদেশ হ'ল দু'মাস সশ্রম কারাবাস। কিছুদিন তাঁকে চোর-ডাকাতের সঙ্গে এক জেলে রাখা হ'ল। এমনকি দিন-কয়েকের জন্যে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় তিনি একটি পিঁজরার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে রইলেন।

কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলন থাম্ল' না। অজস্র লাঞ্ছনা

১৯১৩ সালে আফ্রিকায় মিঃ ক্যালেনবাক্ ও মিসেস পোলক সহ গান্ধীজী

ও দুর্ভোগের সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তি ক্রমশঃ প্রবল থেকে প্রবলতর হ'তে লাগ্‌ল।

ক্ষাত্রধর্ম্মী স্মাট্‌স্‌কে আবার পিছু হট্‌তে হ'ল। অবস্থার গুরুত্ব অনুভব ক'রে তিনি গান্ধীজির সঙ্গে সন্ধি করতে গেলেন। কিন্তু এবারের সন্ধিও বিপদ এড়াবার একটা ক্ষণিক কূটনৈতিক চাল ছাড়া আর কিছুই না।

দু'মাস পরে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গান্ধীজি দু'টো ডেপুটেশানের আয়োজন করলেন। একটীর নেতা হ'য়ে তিনি নিজে বিলেত গেলেন। আর একটি পোলক নামক এক ইহুদীর নেতৃত্বে ভারতে এল। ভারতে পোলক যথেষ্ট সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেলেন। কিন্তু বিলেত থেকে গান্ধীজি শূন্যহাতে ফিরে এলেন।

পরের কয়েক বছর গান্ধীজি ভারতীয়দেব সুসংগঠিত করার দিকে মনোযোগ দিলেন। শুধু তাই নয়, রাস্‌কিনের প্রভাবে টলষ্টয়ের অনুকরণে তিনি কৃষি-কলোনির পত্তন করলেন। সহরের কাছে একটি কৃষি-কলোনি গ'ড়ে তার নাম দিলেন 'টলষ্টয়-ফার্ম'। কয়েকজন ভারতীয়কে একত্র ক'রে তাদের প্রত্যেককে জমি ভাগ ক'রে দিলেন। শুধু তাই নয়, প্রত্যেককে 'দারিদ্র্যের শপথ গ্রহণ করতে হ'ল। এইভাবে আত্মশুদ্ধির পন্থা ঠিক ক'রে তাদের প্রকৃত সত্যাগ্রহী ক'রে তুলতে চাইলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, পরবর্ত্তী সত্যাগ্রহ যেন বিফল না হয়।

তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল না। এবারের সত্যাগ্রহে জেনারেল স্মাট্‌সের অন্তর আতঙ্কে শুকিয়ে উঠ্‌ল, দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্ত-রাষ্ট্রের শক্ত ভিত্তি থর থর ক'রে কেঁপে উঠলে।

১৯১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তর নেটালের খনি-শ্রমিকগণ ও তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ওপর গভর্ণমেন্ট্ মাথা-পিছু তিন পাউণ্ড কর ধার্য্য করলেন। তার প্রতিবাদে প্রায় ছ'হাজার খনি-শ্রমিক ধর্ম্মঘট করলো।

গান্ধীজি বুঝ্‌লেন, এই সুযোগ। তিনি ঠিক করলেন, এই শ্রমিকদের নিয়েই এবারে তিনি সত্যাগ্রহ করবেন।

ভারতীয়দের উত্তেজিত হবার আর একটা কারণ ঘটল। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের উর্ব্বর-মস্তিষ্ক থেকে আর একটী আইন রূপ পেল। এই আইন ভারতীয় নারীদের পক্ষে অত্যন্ত অপমানকর। নিয়ম হ'ল, সরকার-নির্দ্দিষ্ট প্রথায় ভারতীয়গণ বিয়ে না করলে সে-বিয়ে বে-আইনি অর্থাৎ সে নারী ধর্ম্মপত্নী নয়। ভারতে যাদের বিয়ে হয়েছে, এই আইনের একটী খোঁচায় তা' রদ ক'রে দেবার চেষ্টা হ'ল।

১৯১৩ সালের ২৮শে অক্টোবর এই সব খনি-শ্রমিক এবং তাদের পরিবারবর্গকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধীজি নেটাল প্রদেশের নিউ কাস্‌ল্ শহর থেকে ট্রান্সভাল অভিমুখে যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য, পথে গ্রেপ্তার না হ'লে এই সব শ্রমিকরা ট্রান্সভালে তাঁর টলষ্টয় ফার্মে গিয়ে বসবাস করবে; চাষ ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করবে।

সে-এক অপরূপ দৃশ্য। মানুষের ইতিহাস যেন তা'দেখে ক্ষণিকের জন্যে থম্‌কে দাঁড়ালো।

সামনে চলেছেন গান্ধীজি—তাঁকে অনুসরণ ক'রে চলেছে দু'হাজার সাঁইত্রিশজন পুরুষ, একশ সাতাশ জন নারী, পঁচাত্তরটি বালক-বালিকা। অঙ্গে তাদের মলিন বসন, দেহ অর্দ্ধাহারে ক্লিষ্ট—কিন্তু চোখে তাদের অদম্য সাহস, অন্তরে অফুরন্ত উৎসাহ।

১৯১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় টলষ্টয় ফারমে মহাত্মা

একটীর পর একটী শহর পার হ'য়ে এগিয়ে চল্‌ল এই নিরাশ্রয় দুর্গতদের অভিনব মিছিল।

পদেপদে বাধা, নিত্য-নতুন দুঃখ-দুর্ভোগ। শুধু পুলিশের উৎপাত নয়, সেই সঙ্গে আছে পশু-সদৃশ শ্বেতাঙ্গ-জনসাধারণের উন্মত্ত জীঘাংসা। কিন্তু মজুরদের বীরত্ব ও সহিষ্ণুতা, কুলি-কামিনীদের ধৈর্য্য ও আত্মসম্মান, শিশুদের চপল হাস্যময়তা শত নিগ্রহেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ল না।

কুলি-মজুররা চ'লে আসায় খনিগুলি অচল হ'য়ে রইল।

শহরে-শহরে নতুন-নতুন শ্রমিকের দল মিছিলে এসে যোগ দিল। ফলে, শহরের কল-কারখানা পংগু হ'য়ে পড়ল।

এ যেন সত্যিই দেবতার নামে কোন হরতাল—যার সামনে হিংস্র শক্তি অশক্ত।

গভর্ণমেণ্ট্ প্রমাদ্ গণ্‌ল।

পথে গান্ধীজি তিনবার গ্রেপ্তার হ'লেন। তিনবারই জামিনে মুক্তি পেলেন। শেষে প্রথমবারের বিচারে তাঁর ন'মাস, এবং শেষ দু'বারে তিন মাস তিন মাস ক'রে সবশুদ্ধ পনের মাস কঠোর কারদণ্ডের আদেশ হ'ল।

কিন্তু গান্ধীজির অবর্ত্তমানে মিছিল থেমে রইল না। পোলকের নেতৃত্বে অভিযাত্রীদল বন্ধনহারা বন্ধুর পথে এগিয়ে চল্‌লো। ঝড়-জলে বিপর্য্যস্ত হ'য়ে তারা গ্রেলিংষ্টড্ থেকে বালফুরে পৌঁছল। সেখানে পুলিশের একটি বিরাট দল অপেক্ষা করছিল। তিনটী সুদীর্ঘ ট্রেনে ভর্ত্তি ক'রে অভিযাত্রীদের নেটাল জেলে পাঠানো হ'ল। কিন্তু কারাগারে অত লোকের স্থান সঙ্কুলান হবে কেন? তাই অনেক লোককে খনির মধ্যে আটক ক'রে রাখা হ'ল।

এবার ভারতবর্ষে জনমত প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো। জনমতের চাপে শেষ পর্য্যন্ত বড়লাট হার্ডিঞ্জ আফ্রিকা সরকারের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করলেন।

মহা-আত্মার জাদু কাজ করলো—প্রশান্ত অহিংস শক্তির সামনে নতজানু হ'ল হিংস্র অস্ত্রবল। আফ্রিকাবাসী ভারতীয়-

দের সবচেয়ে বনেদি শত্রু জেনারেল স্মাট্‌স্ এবার হার স্বীকার করলেন। সকলকেই মুক্তি দেওয়া হ'ল। চুক্তি অনুযায়ী একটা সাম্রাজ্য কমিশন বস্‌ল। কমিশন প্রায় সমস্ত বিষয়েই গান্ধীজির সঙ্গে একমত হলেন।.

১৯১৪ সালের ২১শে জানুয়ারী সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ হ'ল। তার মাস-কয়েক পরেই দক্ষিণ আফ্রিকাব সরকার সমস্ত ভারতীয়-বিরোধী আইনগুলি অপসবণ করলেন।

মানবাত্মার বিশ-বছর-ব্যাপী সংগ্রাম সফল হ'ল।

জয়মুকুট মাথায় নিয়ে গান্ধীজি স্বদেশে ফিরলেন।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন— ভারতে

প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা গোখ্‌লে বল্লেন, 'মোহনদাস, তুমি ত নেতা হ'য়ে এলে। ভারতে নেতার সংখ্যা একেই ভয়ানক বেশী, তাব ওপর তোমায় আমি সাম্‌লাই কি ক'রে ?'

গোখ্‌লের রসিকতায় গান্ধীজি হেসে বল্লেন, 'আমি নেতা হ'তে চাই না। আমায় সাধারণ কোন দেশের কাজ দিন।'

গান্ধীজির কাঁধে হাত রেখে গোখ্‌লে বল্লেন, 'না, মোহনদাস, এখন দেশের কাজ নয়। আমার কথা দাও, এখন কিছুদিন তুমি রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তুমি অনেকদিন বিদেশে ছিলে, দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তোমার নিজস্ব কোন অভিজ্ঞতা নেই। তোমার প্রথম কাজ হবে সমস্ত দেশ

ঘুরে ঘুরে সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। দেখ, তোমার দেশের লোকেরা কি ভাবে বেঁচে থাকে, তাদের চিন্তার ধারা কি রকম।'

গোখ্‌লে ছিলেন গান্ধীজির রাজনৈতিক জীবনের গুরু। তাঁর আদেশ গান্ধীজি মাথা পেতে নিলেন। পুণা থেকে রাজকোট যাবার পথেই গান্ধীজি জনসাধারণের ডাক শুন্‌তে পেলেন। বিরামগ্রাম ষ্টেশনে দর্জ্জি মতিলাল এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলো। তার মুখ থেকে তিনি শুনলেন বিরামগ্রাম শুল্ক-বিভাগের কর্ম্মচারীদের উৎপাতের কাহিনী। মতিলাল গান্ধীজির কাছে চাইল প্রতিকার। গান্ধীজি মৃদু হেসে বল্লেন, 'জেলে যেতে রাজী আছ ?'

তিনি ভেবেছিলেন, এ-কথা শুনে মতিলাল হয়ত ঘাব্‌ড়ে যাবে। কিন্তু মতিলাল কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে দৃঢ়স্বরে জানালো, 'আপনি যদি আমাদের পথের সন্ধান দেন, আমরা প্রত্যেকে জেলে যেতে রাজী আছি।'

পথিমধ্যে গান্ধীজি নিজে চোখেই দেখ্‌লেন, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি শুল্ক-বিভাগের কর্ম্মচারীদের অসহ্য ব্যবহার। তারা যেন যাত্রীদের মানুষ ব'লেই ভাবে না, ভাবে ছাগল-ভেড়ার সমগোত্রীয়। বুঝলেন, এর একটা বিহিত করা দরকার।

সে-অঞ্চলের লোকদের সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত থাকতে ব'লে সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে ভাইস্‌রয়কে একখানি চিঠি

লিখ্‌লেন। শীঘ্রই এর ফল হ'ল। ভাইস্‌রয়ের আদেশে বিরামগ্রামে শুল্ক পরিদর্শন বন্ধ হ'ল।

গান্ধীজি ভারতের নানা স্থানে ঘুরলেন। গেলেন কুম্ভ-মেলায়, গেলেন হরিদ্বারে, লছমন ঝুলায়। কিন্তু আবার দুঃস্থ জনসাধারণের বেদনা তাঁর প্রাণে সাড়া জাগালো।

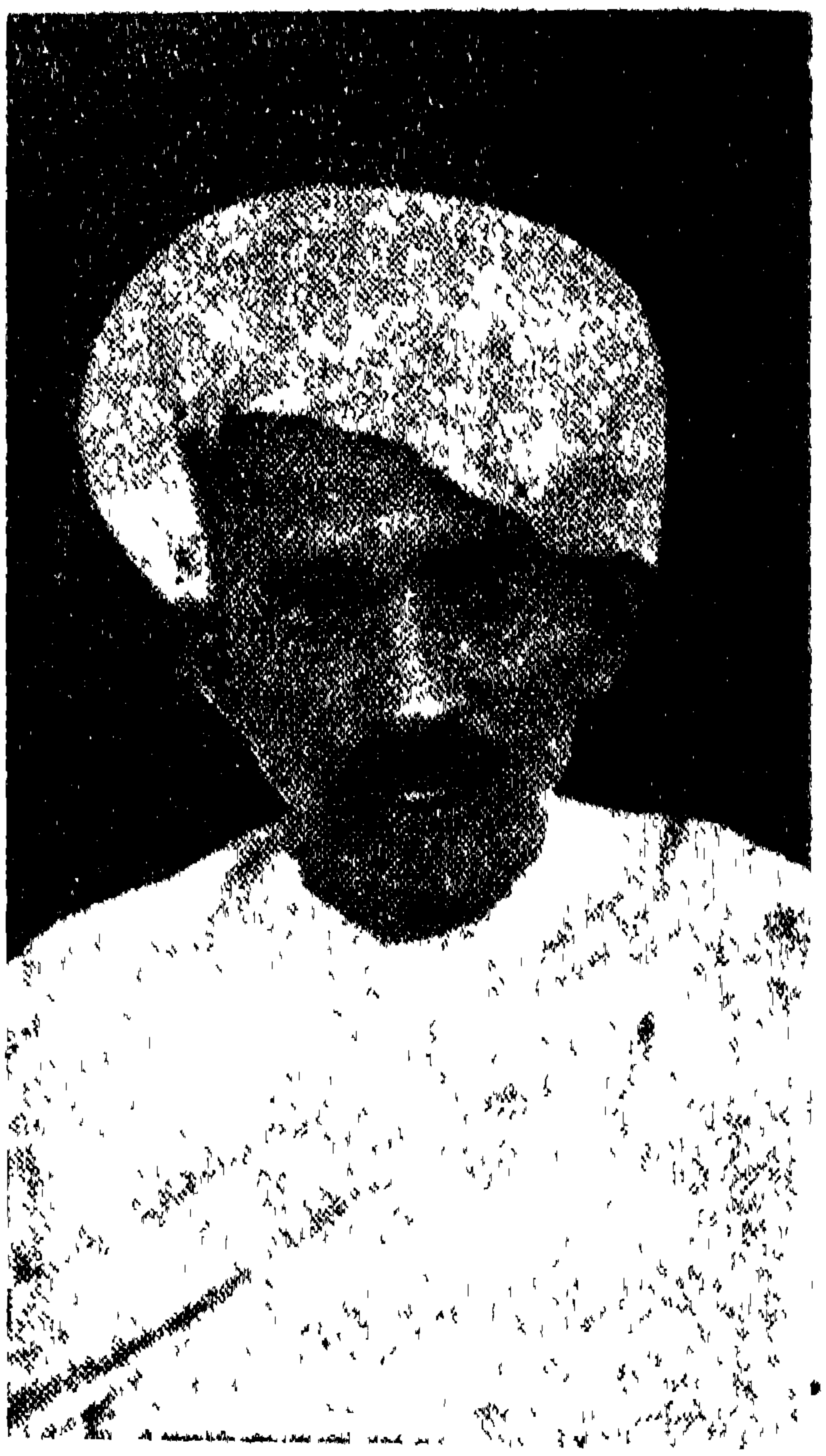
চম্পারণে সত্যাগ্রহে মহাত্মা

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে তাঁর সঙ্গে একটী নিরক্ষর চাষার পরিচয় হ'ল। নাম তার রাজকুমার স্থক্‌লা। আবাস তার বিহারের চম্পারণে। চম্পারণ তখন ইংরেজ নীলকরদের করতলগত। তারা আইনের বলে এখানকার কৃষকদের নীলের চাষ করতে বাধ্য করত। প্রত্যেক কৃষককে তার জমির কুড়ি-ভাগের তিন ভাগ অংশে নীলের চাষ করতে হ'ত। এই নিয়মের নাম ছিল "তিন-কাঠিয়া"। এই নিয়ম অমান্য করলে আইনতঃ চাষীরা যথেষ্ট শাস্তি পেত। এই তিন কাঠিয়ার নির্য্যাতনে চাষীদের দুঃখের সীমা ছিল না।

রাজকুমার স্বুক্লার অনুরোধে গান্ধীজি চম্পারণে গেলেন। উদ্দেশ্য, চাষীদের সত্যিকারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষন করা। বিহারের কয়েকজন উকিল তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তাঁদের মুখে শুন্‌লেন রাজকুমার স্বুক্লার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। তিনি ঠিক করলেন, কিছুদিন চম্পারণের চাষীদের সঙ্গে বসবাস করবেন, তাদের সাহস জাগিয়ে আত্মশক্তি ফিরিয়ে এনে প্রত্যেককে এক-একটি সত্যাগ্রহী ক'রে তুল্‌বেন। তখন তারা নিজেরাই তিন কাঠিয়ার ফাঁস গলা থেকে খুলে ফেলতে পারবে।

নীলকরসাহেবরা দেখ্‌লেন, সমূহ বিপদ। তাঁরা পুলিশের শরণাপন্ন হ'লেন।

১৯১৭ সালের ১৭ই এপ্রিল তিরহুৎ বিভাগের কমিশনার গান্ধীজিকে মোতিহারি ত্যাগ করবার নোটিশ দিলেন। গান্ধীজি সে-আদেশ অমান্য করলেন। ফলে, তাঁর বিচার হ'ল, কিন্তু বিচারপতি গান্ধীজিকে শাস্তি দিতে সাহস করলেন না।

কয়েক মাস পরেই গভর্ণমেন্ট্ গান্ধীজির অনুরোধ শুন্‌লেন। একটী তদন্ত কমিশন বসানো হ'ল। এই তদন্তের ফলে ছ'মাসের মধ্যে তিন কাঠিয়ার ওপর যবনিক-পাত হ'লো।

সেখান থেকে গান্ধীজি গেলেন আমেদাবাদে।

আমেদাবাদের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। মাইনে এত কম যে তা'তে আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকাও চলেনা। তারা অনেকদিন ধ'রেই মাইনে

বাড়াবার জন্যে অনুরোধ করছিল। কিন্তু মিল-মালিকদের কানেই তা' যাচ্ছিল না। শ্রমিকদের মাইনে বাড়াতে গেলে তাঁদের লাভের অংশ কম প'ড়ে যাবে যে।

গান্ধীজি মিল-মালিকদের বল্লেন, 'তৃতীয় পক্ষের সালিশি মান্‌তে আপত্তি কিসের ?'

মিল-মালিকরা রুক্ষভাবে উত্তর দিলেন, 'আপত্তি যথেষ্ট আছে। মাইনে বাড়াবার হ'লে আমরা আপনাথেকেই বাড়িয়ে দিতুম। শ্রমিকদের এ অন্যায় জুলুম মান্‌তে রাজী নই। তা'ছাড়া আমাদের সঙ্গে শ্রমিকদের পিতাপুত্রের সম্পর্ক—তার মধ্যে আপনি কথা বল্‌তে আস্‌ছেন কেন ?'

উপায়ান্তর হ'য়ে গান্ধীজি শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করবার উপদেশ দিলেন। তিনি নিজে ধর্ম্মঘট পরিচালনা করবার ভার হাতে নিলেন।

সবরমতী নদীর তীরে একটী গাছের ছায়ায় বসল, সভা। গান্ধীজি শ্রমিকদের স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিলেন ধর্ম্মঘটের কারণ। বল্লেন, তাদের তিনটি নিয়ম সব সময় মেনে চল্‌তে হবে। এক, কখনো তারা হিংসার সাহায্য নেবে না ; দুই, ভিক্ষার অন্ন গ্রহণ করবে না ; তিন, ধর্ম্মঘট যতদিনই চলুক তারা কখনো অবনত হবে না—বরং ঐ সময় অন্য যে কোন শ্রমের সাহায্যে তারা অন্নের সংস্থান করবে।

ধর্ম্মঘট আরম্ভ হ'ল। শ্রমিকরা প্রত্যহ সেই গাছের তলায় সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে দৃঢ়স্বরে মন্ত্রপাঠের মত বল্‌ত, 'এক তেক'

(ব্রত পালন কর)। তারা পথে-পথে শান্তভাবে শোভাযাত্রা ক'রে বেড়াত—তাদের হাতের পতাকায় লেখা থাক্‌ত 'এক তেক'।

প্রথম দু'সপ্তাহ মিল শ্রমিকরা অদম্য সাহস ও আত্ম-সংযমের পরিচয় দিল। কিন্তু যত দিন এগিয়ে চল্‌ল, যত তাদের ক্ষুধার যন্ত্রণা বাড়তে লাগ্‌লো, তত তাদের মনের বল কমে এল। গান্ধীজির ভয় হ'ল, এইবার বুঝি তারা হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করবে। তারপর এমন একদিন এল, যখন শ্রমিকদের শক্তি একেবারে লুপ্ত হ'য়ে গেল—তারা কাজে যোগ দেবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল।

শ্রমিকরা ব্রতভঙ্গ করতে মনস্থ করেছে দেখে গান্ধীজি চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। কি ভাবে তাদের সংযত করা যায়? হঠাৎ তিনি আলোর সন্ধান পেলেন। শ্রমিকদের জানালেন, যদি তারা পূর্ন সাফল্য পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট না চালায় ত তিনি সেইদিন থেকে অনশন আরম্ভ করবেন।

গান্ধীজির অনশনের ফলে শ্রমিকরা তাদের লুপ্ত শক্তি ফিরে পেল। পূর্ণ-উদ্যমে ধর্ম্মঘট চল্‌ল। বাইশদিন ধর্ম্মঘটের পর মিল-মালিকরা নত হলেন। শ্রমিকদের সমস্ত দাবী তাঁরা মেনে নিলেন। দেশ শুদ্ধ শ্রমিকদের অন্তরে গান্ধীজির আসন স্থায়ীভাবে পাতা হ'য়ে গেল।

ধর্ম্মঘটের পর গান্ধীজি নিঃশ্বাস নেবারও সময় পেলেন না। সেখান থেকে দৌড়লেন গুজরাটের খেড়া অঞ্চলে।

সে বছর ভাল ফসল না হওয়ায় খেড়া জেলায় প্রায় দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা হয়। এ-অবস্থায় কৃষকগণ খাজনা দেয় কি ক'রে? তারা সে বছরের খাজনা বন্ধ রাখতে অনুরোধ করলো।

সরকারী নিয়ম অনুযায়ী তাদের এ-অনুরোধ করবার অধিকার ছিল। নিয়ম ছিল, এক-চতুর্থাংশ কিম্বা তার কম ফসল হ'লে, কৃষকেরা এক-বছরের খাজনা পরের বছর প্রাচুর্য্যের সময় শোধ দিতে পারে। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীদের স্বভাব কৃষকদের পেছনে লাগা। তারা গভর্ণমেণ্ট্‌কে জানালো, কৃষকরা ফাঁকী দেবার মতলবে মিথ্যেকথা বল্‌ছে—আসলে ফসল যথেষ্ট হয়েছে।

অনুরোধ-উপরোধ ব্যর্থ হওয়ায় গান্ধীজি ঠিক করলেন, চাষী-দের সত্যাগ্রহ শিক্ষা দেবেন। তিনি তাদের একত্রিত ক'রে এই শপথ করিয়ে নিলেন, 'আমাদের ন্যায্য-প্রার্থনা গভর্ণমেণ্ট নামঞ্জুর করায় আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, স্বেচ্ছায় আমরা এ-বছরের খাজনা দেব'না। তার জন্যে গভর্ণমেণ্ট্‌ আইনের খড়্গ তুলে আমাদের ওপর যতখুসী অত্যাচার করুন, আমরা নীরবে তা'সহ্য করব। আমাদের জমি বাজেয়াপ্ত হোক্‌, তবু আমরা মিথ্যার আশ্রয় নোব'না—এমন কোন কাজ করব'না যা'তে আমাদের আত্ম-সম্মানের হানি হয়।'

চাষীরা সত্যাগ্রহ সুরু করলো। গান্ধীজি গ্রামে-গ্রামে ঘুরে তাদের অভয় দিতে লাগলেন। তাদের বুঝিয়ে দিলেন,

রাজকর্ম্মচারীরা আসলে চাষীদের প্রভু নয়—তারা জনসাধারনের ভৃত্য। এই ভাবে তাদের ভয় ভেঙে গেল।

গভর্ণমেণ্টের নির্য্যাতন আস্‌তেও দেরী হ'ল না। কর্ম্মচারীরা চাষীদের গরু-বাছুর বিক্রী ক'রে দিল। চাষীদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হ'য়ে গেল। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষেতের ফসল পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত ক'রে নিল।

একটি পেঁয়াজের ক্ষেত গভর্ণমেণ্ট্ বাজেয়াপ্ত ক'রেছিল। গান্ধীজি ভাব্‌লেন, এটা অন্যায়। তাই তিনি কয়েকজনকে ক্ষেত থেকে আইন অমান্য ক'রে সমস্ত পেঁয়াজ তুলে আন্‌তে বল্লেন। মোহনলাল নামে একজন এই কাজের জন্যে এগিয়ে গেলেন। ফলে, পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলো এবং বিচারে তাঁর ওপর কারাবাসের হুকুম হ'ল।

কিন্তু এই ডুংলী-চোর অর্থাৎ পেঁয়াজ-চোরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে চাষীদের সত্যগ্রহ দুর্দ্দমনীয় আকার ধারণ করলো। শেষ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট্‌কে হার স্বীকার করতে হ'ল। সত্য ও অহিংস-বল আবার জয়লাভ করলো।

এইভাবে কয়েকটী ঘটনার মধ্য দিয়ে গান্ধীজি দেশের নিরন্ন-নিরক্ষর চাষী ও মজুরদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মেশবার সুযোগ পেলেন। শুধু তাই নয়, ভারতের মাটীতে সত্যাগ্রহের ক্ষমতা বেশ ভাল ভাবেই পরখ্ ক'রে নিলেন।

ইতিমধ্যে ১৯১৪ সালে পৃথিবী-ব্যাপী মহাযুদ্ধ বেধে গেছ্‌ল। গান্ধীজি তখনও ইংরেজদের ন্যায়-বিচার ও সভ্যতায়

বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যের একজন নাগরিক মাত্র।' তা'ছাড়া, গান্ধীজি ভেবেছিলেন, এ-যুদ্ধ সত্যি সত্যিই ন্যায়-যুদ্ধ—ডেমোক্র্যাসিকে রক্ষা করবার যুদ্ধ। তাই কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণের মত তিনিও ভারতবাসীকে আহ্বান করে ছিলেন যুদ্ধে যোগ দিতে—তাদের কর্ত্তব্য সমাপন করতে।

অবশ্য এ-ব্যাপারে তিনি একা ছিলেন না। সমস্ত ভারত-বর্ষই এই যুদ্ধ-শেষের—যুদ্ধের ধাপ্পাবাজিতে ভুলে গেছ্‌ল। ইংলণ্ড তখন নিপুণ প্রদর্শকের মত ভারতবাসীর চোখের সামনে অনেক আশা ও অঙ্গীকারের রঙীন ছবি নাচিয়ে বেড়াচ্ছিল। ১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারত সচিব ই. এস. মণ্টেগু বলেছিলেন, 'ভারতবাসী যদি যুদ্ধে সাহায্য করে, তবে সেই বিশ্বস্ততার পুরস্কার-স্বরূপ ভারতকে দায়িত্বশীল শাসন-অধিকার দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মেসোপোটেমিয়ার রণাঙ্গনে মিত্রশক্তির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ও বিপজ্জনক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। ২রা এপ্রিল তারিখে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ ভারতবাসীর কাছে এক আবেদন জানালেন এবং কয়েক দিন পরে স্পষ্ট ভাষায় ভরসা দিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের আর বিশেষ দেরী নেই। এইভাবে মিষ্টি কথায় মুগ্ধ হ'য়ে আত্ম-বিস্মৃত ভারত বিপুলভাবে ইংরেজদের সাহায্য পাঠালো—পাঠালো প্রায় দশ লক্ষ সৈন্য আরও প্রচুর অর্থ ও

প্রচুর খাদ্য। এর জন্যে ভারতবাসীদের যে স্বার্থত্যাগ করতে হ'ল, তার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়।

কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই র'য়ে গেল। একদিন বাস্তবের নিষ্ঠুর রূঢ় আলোকে ভারতবাসী জেগে উঠ্‌ল। ঐ বছরেই তুরস্ক ইংরেজদের কাছে পরাজিত হ'ল। পশ্চিম সীমান্তেও ইংরেজদের খুব বেশী ভয়ের কারণ রইল না। ফলে, শ্বেতাঙ্গ ইংরেজদের স্মরণ শক্তির ব্যাঘাত ঘট্‌ল—তারা একদম ভুলে গেল, ভারতবর্ষ কোন রকমে কখনো তাদের কোন উপকার করেছে। সন্ধি-সংক্রান্ত কাজ মেটার সঙ্গে-সঙ্গেই ইংরেজদের মুখের মানবতা-পূর্ণ মিষ্টি হাসি হিংস্র-জন্তুর হিংস্রতর দাঁত-খিঁচুনিতে পরিণত হ'ল।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘট্‌ল। গান্ধীজি সবিস্ময়ে দেখ্‌লেন, বুয়র-যুদ্ধের পরে ঘটনাগুলি ভারতের মাটিতে যেন একে-একে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভারতবাসী কিছুমাত্র স্বাধীনতা ত পেলই না, উপরন্তু নাগরিকদের যে স্বাধীন অধিকারগুলি ছিল, সে গুলি অপহরণ করার দিকে এইবার সরকার মনোযোগ দিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লীর সাম্রাজ্যবাদী আইন সভায় রাউলাট বিলের আবির্ভাব হ'ল। যুদ্ধের সময় যে-সব ভারত-রক্ষা আইন প্রচলিত ছিল, এই বিলে সেগুলিকে আবার নতুন ভাষায় লেখা হ'ল। দেশের সর্ব্বত্র গোয়েন্দা পুলিশদের হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা দেয়া হ'ল। আর সেন্সরের বেড়াজালে ভারতবাসীর নিঃশ্বাস রোধ করবার হীন-ষড়যন্ত্র চল্‌ল।

গভর্ণমেণ্ট্ কারণ দেখাল, ভারতের কয়েকদল তরুণ বাহুবলে ইংরেজ-রাজত্বের পতন ঘটাবার চেষ্টা করছে। আসল উদ্দেশ্য, ভারতবাসী যেন ইংরেজদের কাছে কৃতজ্ঞতার পুরস্কার দাবী না করতে পারে।

মহাত্মার রাষ্ট্রগুরু গোখেল

এইবার মোহমুক্ত ভারতের সহরে-সহরে গ্রামে-গ্রামে প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের দিকে এগিয়ে চলল। বিপ্লবের দূরাগত ঝঞ্ঝার কানে ভেসে এল।

গান্ধীজি শুন্‌তে পেলেন সেই ধ্বনি। শুনে উৎসাহিত হলেন যতখানি, বিচলিত হলেন তার চেয়ে বেশী। তাঁর ভয় হ'ল, হঠাৎ-জাগা জনতা হয়ত আত্মঘাতী হিংসার পথে অগ্রসর হ'য়ে যাবে। তাই তিনি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে এলেন। বিদ্রোহ আস্‌ছে, তাকে পথ দেখাতে হবে। বিপ্লব আস্‌ছে, তাকে হিংসা থেকে অহিংসার পথে নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু কোন পথ দিয়ে অহিংসভাবে রাউলাট আইনকে রোধ

করা যায় ? রোধ করতে না পারলেও কি ভাবে তার বিরুদ্ধে কার্য্যকরী প্রতিবাদ জানানো যায় ? এখানে আইন অমান্য করার প্রশ্নই ওঠে না। গভর্ণমেণ্ট যদি আইনটা প্রয়োগ করতে না চায় ত অমান্য করা হবে কি ? অমান্য করলেও পুলিশ যদি গ্রেপ্তার না করে ত সমস্ত ব্যাপারটাই হাস্যকর হ'য়ে দাঁড়াবে। গান্ধীজি মহা সমস্যায় প'ড়ে গেলেন।

এই সব কথা ভাব্‌তে ভাবতে একদিন রাত্তিরে গান্ধীজি ঘুমিয়ে পড়লেন। ভোরের দিকে যখন তিনি আধ-তন্দ্রা আধ-জাগরণের রাজত্বে বিচরণ করছেন, তখন হঠাৎ তিনি আলোর সন্ধান পেলেন। তাঁর মনে হ'ল যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছেন। স্বপ্ন হ'লেও উপায়টা কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভুল।

তক্ষুনি শয্যাত্যাগ ক'রে উঠে পড়লেন। সঙ্গীদের ডেকে বল্লেন, পথ পেয়েছি। দেশের কাছে ঘোষণা করলেন, 'আমাদের আন্দোলন আরম্ভ হবে ৬ই এপ্রিল সারা দেশ-ব্যাপী একটী হরতাল দিয়ে। সত্যাগ্রহ আত্মশুদ্ধির পথ এবং আমাদের বিদ্রোহও ধর্ম্মযুদ্ধ, তাই ঐ দিন উপাসনা ও অনশন ক'রে সারা দেশ চিত্তশুদ্ধি ক'রে নেবে।'

গান্ধীজি যেন জাতির বিবেকের গভীরতম অংশ স্পর্শ করলেন। যদিও এই হরতাল ভারতের ইতিহাসে প্রথম, তবুও সারা দেশ বিপুলভাবে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল। সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য ! হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত প্রতিটী সহরে প্রতিটী গ্রামে সম্পূর্ণ হরতাল পালিত হ'ল। এই

প্রথম ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়, সমস্ত শ্রেণী একসঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কোন কাজ করল'। এই প্রথম ভারতবর্ষ তার অগ্র-গতির ছন্দ আবিষ্কার করল।

দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই শান্তভাবে হরতাল অনুষ্ঠিত হ'ল। কেবল কয়েক জায়গায় গোলযোগের সৃষ্টি হ'ল। দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে হরতাল করল'। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জুম্মা মসজিদে বক্তৃতা দেবার জন্যে নিমন্ত্রিত হলেন। কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ মিলন পুলিশ সহ্য করতে পারল' না। অকারণে শোভাযাত্রার ওপর গুলি চালালো—আর তারপর চলল নানা রকমের অত্যাচার। এই বুঝি জনতার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। গান্ধীজি দিল্লী রওনা হ'লেন জনসাধারণকে তাদের কর্ত্তব্য বোঝাবার জন্যে।

মথুরা ষ্টেশনে পৌঁছে গান্ধীজি শুনলেন, তাঁকে নাকি গ্রেপ্তার করা হবে। কয়েক ষ্টেশন পরেই পুলিশ তাঁর ওপর নোটিশ জারী করল, তিনি পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে পারবেন না, কারণ তাঁর উপস্থিতিতে গণ্ডগোল বাধতে পারে। পুলিশ বল্লে, 'আপনি ট্রেন থেকে নেমে পড়ুন।'

গান্ধীজি দৃঢ়স্বরে বল্লেন, 'না। কারণ আমি পাঞ্জাবে যাচ্ছি, শান্তিভঙ্গ করতে নয়, শান্তি বজায় রাখতে।' পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে সে-ট্রেন থেকে নাবিয়ে নিল। তারপর তাদের অধীনে গান্ধীজি একখানি বোম্বেগামী গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে উঠ্‌তে বাধ্য হলেন। পরদিন লাহোর থেকে

একজন পুলিশ ইনস্পেক্টব এসে তাঁর ভার নিলেন। এবার গান্ধীজিকে প্রথম শ্রেণীব কামরায় তোলা হ'ল। এতক্ষণ যেন তিনি সাধাবণ বন্দী ছিলেন. এইবার হলেন ভদ্রলোক বন্দী।

পুলিশ ইনস্পেক্টর বল্লেন, 'দেখুন, আপনি যদি নিজের ইচ্ছায় বোম্বে ফিবে যান ত সব দিক দিয়েই ভাল হয়। পাঞ্জাবে যাবাব ইচ্ছে আপনি ত্যাগ করুন।'

গান্ধীজি বল্লেন, 'তা' হয় না। পাঞ্জাব থেকে আমাব ডাক এসেছে—সেখানে আমাব যাবার প্রয়োজন। আপনাদের কতগুলো মনগড়া যুক্তি শুনে সে-ইচ্ছে ত্যাগ কবতে আমি রাজী নই। আপনারা যদি এখন আমায় ছেড়ে দেন ত আমি আবার পাঞ্জাবের দিকে যাত্রা করব'।'

ইন্‌স্‌পেক্টর নীরসস্বরে বল্লেন, 'I see. আমবা জোব না খাটালে আপনার একগুঁয়েমী যাবে না।'

বোম্বে পৌঁছেই গান্ধীজি শুন্‌লেন, তাব গ্রেপ্তাবেব সংবাদে জনতা ক্ষেপে গেছে। যে কোন মুহূর্ত্তেই তাবা হিংসাব আশ্রয় নিতে পাবে। ট্রেন থেকে নেবেই তিনি দৌড়লেন জনতাকে শান্ত কবতে। তাঁর মোটব কাছে আস্‌তেই জনতা আনন্দে জয়ধ্বনি ক'রে উঠ্‌ল। পুলিশ যেন এতক্ষণ এইজন্যেই অপেক্ষা কবছিল। এইবার অশ্বারোহী পুলিশ-বাহিনী নিরস্ত্র জনতার ওপর চার্জ করল'। তারা যেন অহিংসাব মন্ত্রদাতাকে দেখাতে চাইল হিংসার ক্ষমতা কতখানি। তাঁব চোখেব সামনে জনতা

ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ল। গান্ধীজি স্তব্ধভাবে শুনলেন, ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে কত হতভাগ্যের আর্ত্তনাদ।

গান্ধীজি পুলিশ কমিশনারের কাছে গেলেন এই ঘটনার নিন্দা করতে।

পুলিশ কমিশনার রূঢ়স্বরে বল্লেন, 'আপনি ত লোকদের ক্ষেপিয়েই খালাস, কিন্তু তার তাল সাম্‌লাতে হয় আমাদের। আজ্‌কে ঐভাবে চার্জ না করলে জনতা এতক্ষণে সমস্ত কন্ট্রোলের বাইরে চ'লে যেত। জানেন আমেদাবাদে কি ঘটেছে? জানেন অমৃতসরের কথা?'

আমেদাবাদে সত্যি-সত্যি গোলযোগ ঘটেছিল। মিল-শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট ক'রে বেরিয়ে আসে, তারপর হিংসাত্মক কাজও করে। একজন পুলিশ সারজেণ্ট খুন হয়—নাদীয়াদের কাছে রেল লাইন তুলে ফেল্‌বার চেষ্টা হয়। ফলে, আমেদাবাদে সামরিক আইন জারি হয়েছে।

গান্ধীজি আমেদাবাদে গিয়ে জনতাকে শান্ত করলেন—বুঝিয়ে দিলেন সত্যাগ্রহের আসলরূপ।

কিন্তু অমৃতসরের অবস্থা হ'ল শোচনীয়। গান্ধীজির গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনে সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধ্‌লো। উন্মত্ত জনতা লুটপাট ও খুনখারাপি ক'রে বস্‌ল। ১১ই এপ্রিল জেনারেল ডায়ার সৈন্যসামন্ত নিয়ে সহর ঘেরাও ক'রলেন। আবার শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কিন্তু ডায়ার জনতার ব্যবহার ভুল্‌ল না। ১৩ই তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগে সে শোধ

নিল। জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের চারিপাশে উঁচু পাঁচীল—তার ভেতর কুড়ি হাজার লোক, শিশু ও নারীর সংখ্যাও কম নয়। ডায়ার তাব সৈন্যসামন্ত নিয়ে সেই নিবস্ত্র শান্ত জনতাব ওপর অবিরাম দশ মিনিট ধ'বে এলোপাথাড়ি গুলি চালালো।

তাবপর সুরু হ'ল পাঞ্জাবে সামরিক আইনের বিভীষিকা। এরোপ্লেন থেকে নিরস্ত্র জনতার মাথায় বোমা পডতে লাগল। দেশের গণ্যমাণ্য লোকদেব ধ'বে এনে সামবিক আদালতে প্রকাশ্যে চাব্‌কানো হ'ল, পথের ধূলায় পশুর মত হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করা হ'ল। লাঞ্ছনা ও অপমানের তাণ্ডব নৃত্য চল্‌তে লাগ্‌ল। যেন শাসক-সম্প্রদায় মহাত্মার অহিংসবাণীকে উপহাস করছে।

সারাভাবত জুড়ে ঘৃণা ও বেদনার ঢেউ ব'য়ে গেল। ভারত-বাসী নিরুপায় ক্রোধে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে গান্ধীজির কাছে অনুরোধ জানালো, 'মহাত্মা' অনুমতি দাও, আমরা এব প্রতি-শোধ নিই।'

গান্ধীজি অবিচলিতভাবে বল্‌লেন, 'জালিয়ানওয়ালাবাগ ভারতবাসীর মন্ত্রদীক্ষার পবিত্র তীর্থস্থান। পৃথিবীব অন্যকোন জাতি যে পথে এগোতে সাহস পায়নি, সে পথে যদি আমরা লক্ষ্যে পৌছতে চাই, তবে এক হাজার কেন, হাজার হাজার নিরপরাধ নরনারীব হত্যাকে নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করতে হবে। ফাঁসী যাওয়াকে প্রত্যেক মানুষের জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপার ব'লে ধরতে হবে।'

এই গোলযোগের মাঝেই ভারতের রাজনৈতিক আকাশে আর একখানা কালো মেঘ প্রলয়ের সঙ্কেত বুকে নিয়ে দেখা দিল।

১৯১৪ সালের যুদ্ধে তুরস্ক ইংরেজের বিপক্ষে যোগ দিয়েছিল। ফলে ভারতীয় মুসলমানরা প'ড়েছিল মুস্কিলে। একদিকে তারা ইংরেজদের প্রজা, অন্যদিকে তুরস্কের খলিফা তাদের ধর্ম্মনেতা। এই অবস্থায় তারা যুদ্ধে সাহায্য করতে রাজী হয়েছিল একটী সর্ত্তে। সে সর্ত্ত হ'ল, যুদ্ধের শেষে ইউরোপীয় তুরস্ক তুর্কীদের হাতেই থাক্‌বে এবং তুরস্কের সুলতান মেসোপটেমিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি আরব প্রদেশগুলির ওপর সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্ব করবেন। লয়েড জর্জ্জ এবং ভারতের বড়লাট উভয়েই এই সর্ত্তে রাজী হ'ন।

যুদ্ধের শেষে পরিকল্পিত সন্ধি-সর্ত্তগুলির কঠোরতা দেখে ভারতীয় মুসলমানরা বিচলিত হ'য়ে পড়ল। তারা বুঝ্‌ল, ইংরেজরা নির্লজ্জের মত এ অঙ্গীকারও ভঙ্গ করেছে। এইভাবে যে আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের সুরু হ'ল, তার নাম হ'ল খিলাফৎ আন্দোলন। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লীতে এক সর্ব্বভারতীয় খিলাফৎ সম্মিলন ঘটল। গান্ধীজিকে ডাকা হ'ল এই সম্মিলনের সভাপতিত্ব করতে।

গান্ধীজি দেখলেন, এই সুযোগ। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রে গান্ধীজির প্রথমে চোখে প'ড়েছিল হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ। তিনি জানতেন, এই বৈরতার মূলে ধর্ম্ম

থাক্‌লেও, আসলে তাকে জিইয়ে রেখেছে ইংরেজ নানারকম রাজনৈতিক উস্‌কানি দিয়ে। এই ব্যবধান ও কলহ দূর করবার পথ খুঁজছিলেন তিনি। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, হিন্দু-মুসলমান একবদ্ধ না হ'লে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে অনেক বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি হবে। এখন খিলাফতের পটভূমিকায় তিনি হিন্দু মুসলমানকে একসঙ্গে মেলাতে চাইলেন।

তিনি বল্‌লেন, 'হিন্দু, পার্শী, খৃষ্টান, ইহুদি আমরা যাই হই না কেন, আমরা যদি একটী মাত্র নেশন হিসেবে বেঁচে থাক্‌তে চাই, তবে আমাদের একজনের স্বার্থকে সকলের স্বার্থ ক'রে তুলতে হবে। শুধু আমাদের ভেবে দেখতে হবে দাবীটা ন্যায়সঙ্গত কি না। তিনি ঘোষণা করলেন, খিলাফতের সমর্থনে মুসলমানের দাবীকে হিন্দুর দাবী ক'রে তুলতে হবে।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সকলেই চাইছিল। সুতরাং সহজেই ভারতের জনসাধারণ তাঁর কথায় সায় দিল। কয়েকটী সভা-সমিতি ক'রে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে ইংলণ্ডকে জানালো, সন্ধির সর্ত্তে ভারতের মতামত অগ্রাহ্য করলে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে।

গভর্ণমেণ্ট্‌ সে কথা বুঝলেন। ভারতবাসীদের ঠাণ্ডা করবার জন্যে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি ক'রে এক শাসন-সংস্কারের সূচনা হ'ল। এই সংস্কারের ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনে ভারতের জনসাধারণকে

অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হ'ল। শুধু তাই নয়, ঠিক হ'ল সমস্ত রাজবন্দীদের মার্জ্জনা করা হবে।

গান্ধীজির উপদেশে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই সংস্কার গ্রহণ করতে রাজী হ'ল।

কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল, এটা মিথ্যাচারী ইংরেজদের আর একটি চাল। রাজবন্দীদের মার্জ্জনা করা ত হ'লই না, উপরন্তু তাঁদের কয়েকজনের ফাঁসী হ'য়ে গেল। আবার এই সময়েই তুরস্কের সঙ্গে সন্ধির অপমানকর সর্ত্তগুলির কথা ভারত জানতে পারলো। এইবার ভারতবাসীর ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াল।

প্রথমে খিলাফৎ কমিটি ও পরে এলাহাবাদে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সভা গান্ধীজির অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করল। এই বৃত্তান্ত জানিয়ে গান্ধীজি বড়লাটকে একখানি চিঠি লিখলেন। তিনি লিখলেন, 'এখন আমার মত যে-কোন ব্যক্তির কাছে একটা মাত্র পথ গ্রহণের সুযোগ অবশিষ্ট আছে, এবং তা'হ'ল বৃটিশ শাসনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা।'

১৯২০ সালের ২৮শে জুলাই গান্ধীজি ঘোষণা করলেন, ১লা আগষ্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলন সৃষ্টি হবে। জনসাধারণ যেন তার আগের দিন উপাসনা ও অনশনের জন্যে পবিত্র হরতাল পালন করে।

দু'মাস ধ'রে অনেক চিন্তার পর তিনি অসহযোগের কর্ম্ম-

তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। এইবার তা' ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার আরম্ভ করলেন।

১। খেতাব ও অবৈতনিক চাকরী ত্যাগ করতে হবে।

২। সরকারী ঋণের অংশ গ্রহণ করা চল্‌বে না।

৩। আইনজীবীরা সাময়িকভাবে ওকালতি বন্ধ রাখবেন এবং সালিশির দ্বারা দেওয়ানি মামলার মীমাংসা ক'রে দেবেন।

৪। পিতামাতাদের সরকারী স্কুল বয়কট করতে হবে। ছাত্ররা সরকারী কলেজ বয়কট করবে।

৫। সংস্কার অনুযায়ী যে কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে, তা' বর্জ্জন করতে হবে।

৬। সরকারী ভোজসভায় বা জলসায় যোগ দেওয়া চল্‌বে না।

৭। সামরিক বা অসামরিক যে কোন সরকারী চাকরী গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে হবে।

৮। স্বদেশীর প্রচার করতে হবে।

১লা আগষ্ট দক্ষিণ আফ্রিকার সেবাকার্য্যের জন্যে পাওয়া কাইজার-ই-হিন্দ্ স্বর্ণপদক গান্ধীজি বড়লাটকে ফেরৎ পাঠালেন। দেখ্‌তে দেখতে ভারতের নানাস্থানে বহুলোকে গান্ধীজির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন। শত শত আইনজীবি এবং বিচার-বিভাগের কর্ম্মচারীরা পদত্যাগ-পত্র দাখিল করলেন। হাজার হাজার ছাত্র কলেজ ত্যাগ করল।

স্কুলগুলি জনশূন্য হ'য়ে গেল। আদালতগুলি বয়কট করা হ'ল।

গান্ধীজি মওলানা শওকৎ আলির সঙ্গে দেশময় ঘুরে-ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন। তাঁদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখ্‌লে মনে হ'ত যেন গালিভার ও লিলিপুটের একজন অধিবাসী। গান্ধীজি বেঁটে এবং ক্ষীণকায়, অন্যদিকে শওকৎ আলির লম্বা-চওড়া বিরাট চেহারা। কোন সভায় প্রচণ্ড ভিড় দেখে গান্ধীজি যখন ভয়ে পেছিয়ে পড়তেন, শওকৎ আলি একগাল হেসে বল্‌তেন, 'ভয় কি, মিঃ গান্ধী? সে-রকম বেগতিক দেখ্‌লে আপনাকে আমি পকেটের মধ্যে পুরে নোব।'

গান্ধীজি সহরে-সহরে একই কথা বার-বার ক'রে লোককে বোঝাতে লাগ্‌লেন।

'জাতির সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কর্ত্তব্য হ'ল শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনকে সুশৃঙ্খল ক'রে তোলা।' 'অনিয়মের ভেতর থেকে নিয়মকে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে। অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবক ছাড়া আর কেহ বিরাট কোন সভা বা শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করতে পারে না।'

'ক্রোধ থেকে আসে বিশৃঙ্খলা। বিন্দুমাত্রও হিংসার অস্তিত্ব থাক্‌লে চল্‌বে না। প্রতিটী হিংসার অর্থ হ'ল পেছনে হ'টে আসা, নিরপরাধ জীবনের নিরর্থক অপব্যয়।'

কিন্তু গান্ধীজি শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন চাননি—তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আরও ব্যাপক ও গভীরতর। ভারতকে তিনি

শুধু স্বাধীন দেখ্‌তে চাননি, ধর্ম্ম-সম্পদ ও বস্তু-সম্পদ দু'দিক দিয়েই তাঁর মাতৃভূমিকে স্বতন্ত্র দেখ্‌তে চেয়েছিলেন। অর্থনীতির দিক থেকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার নামই স্বদেশী। স্বদেশীর জন্যে ভারতকে অনেক আরাম বিসর্জ্জন দিতে হবে, অনেক ত্যাগ শিখ্‌তে হবে। ফলে, ভারতে এক স্বাস্থ্যকর সংযমের সূত্রপাত হবে।

এর প্রথম সোপান হ'ল মদ্য-পান বন্ধ করা। বিলিতি মদ বয়কট করা হবে, অসংখ্য পান-বিরোধীর দল গঠন করা হবে, এবং মদ্য-বিক্রেতাদের অনুরোধ-উপরোধের দ্বারা লাইসেন্স ত্যাগ করাতে হবে। দেশের লোক এ কথা বুঝ্‌ল—মদের দোকানে-দোকানে চললো পিকিটিং। উন্মত্ত জনতা যা'তে গায়ের জোরে মদের দোকান বন্ধ না করে সেজন্যে গান্ধীজি নিজে অনেক যায়গায় উপস্থিত হ'য়ে বুঝিয়ে দিলেন, 'গায়ের জোরে মানুষকে পবিত্র করবার অধিকার কারও নেই।'

কিন্তু মদ্যপান বন্ধ করলেও, স্বদেশীর দ্বিতীয় সোপান বিলিতি জিনিষ কি ক'রে বর্জ্জন করা যায়? আমাদের পরিধানের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ দিশি কাপড় কোথায়? গান্ধীজি অত্যন্ত সহজ এক উপায় বাৎলে দিলেন। তিনি বল্লেন, চরকার পুরানো গৃহশিল্পকে আবার ভারতের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গান্ধীজি তিনটী নিয়ম বেঁধে দিলেন: ১। বিলিতি কাপড়ের বয়কট, ২। সূতা কাটার পুণঃপ্রবর্ত্তন ও প্রচার, ৩। কেবলমাত্র খদ্দর পরবার শপথ গ্রহণ। তিনি

চাইলেন, সূতা কাটা সমস্ত ভারতবর্ষ কর্ত্তব্য স্বরূপ গ্রহণ করবে, বিদ্যালয়ে এর শিক্ষা দেওয়া হবে, নিজেদের কাটা সূতা দিয়ে গরীব ছেলেমেয়েরা স্কুলের মাইনে দিতে পারবে, এবং প্রত্যেক নরনারী প্রতিদিন অবকাশমত একঘণ্টা ধ'রে সূতা কাটবেন।

এবারেও তিনি জনসাধারণের কাছে সমর্থন পেলেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরাও রোজ চরকা চালাতে লাগলেন। সারা দেশ জুড়ে নরনারী নির্বিশেষে খদ্দর-পরার ঢেউ উঠল।

১৯২৯ সালের আগষ্ট মাসে গান্ধীজি বোম্বেতে সমস্ত বিলিতি জিনিষ পুড়িয়ে ফেলতে হুকুম দিলেন। বহুমূল্য জিনিষপত্র স্তুপাকার ক'রে তা'তে আগুন দেওয়া হ'ল এবং সেই লেলিহান বহ্নিশিখাকে সাক্ষী ক'রে জনতা স্বদেশীর শপথ গ্রহণ করল।

মহমান্য সরকার বাহাদুর অবশ্য নিষ্ক্রিয় ব'সে ছিলেন না। প্রথমটা ব্যঙ্গ ক'রে অসহযোগ আন্দোলনকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড প্রথমে আন্দোলনকে বলেছিলেন 'মূঢ় পরিকল্পনাগুলির মধ্যে মূঢ়তম।' কিন্তু বেশীদিন এই রকম অমায়িক তাচ্ছিল্যের ভাব রইল' না। অসহযোগ আন্দোলন যত শক্তিশালী হ'য়ে উঠছিল, গভর্ণমেণ্টের ভয়ও তত বেড়ে যাচ্ছিল। এই সময় কংগ্রেসের অধিবেশনে ঘোষণা করা হ'ল, 'যদি সম্ভব হয় তবে ইংলণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে, আর যদি সম্ভব না হয় ত তাকে বাদ দিয়ে ভারত

আপনার লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবে।' একথা ব্রিটিশ-সরকারের অসহ্য লাগ্‌ল'। ১৯২১ সালের মার্চ্চ মাসে দমন আরম্ভ হ'ল। সরকার হস্তক্ষেপের কারণ দেখালেন, জনতার আক্রোশের হাত থেকে মদের দোকানদারদের রক্ষা করা প্রয়োজন। সরকার যেন নির্লজ্জভাবে স্বীকার করলেন, মদ খাওয়া বন্ধ করলে পাশ্চাত্য সভ্যতা রসাতলে যাবে। অসহযোগের স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘগুলোকে ভেঙে দেওয়া হ'ল। ১৪৪ ধারা জারী করা হ'ল। আন্দোলনকে বলা হ'ল 'বিপ্লবী ও অ্যানার্কিষ্ট্' হাজার হাজার লোক কারারুদ্ধ হ'ল। দেশের অনেক শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের বিনা বিচারে আটক করা হ'ল এবং জেলের অন্তরালে তাঁদের ওপর অত্যাচার চললো।

পুলিশজুলুম গান্ধীজির কাজের ব্যাঘাত ঘটাতে পারল না। তিনি তখন দেশকে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে মেতে উঠেছেন। শুধু জাতিগত ও ধর্ম্মগত পার্থক্য দূর করলেই হবে না, শ্রেণীগত ও সমাজগত পার্থক্য দূর ক'রে দিতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আরও দু'টী আন্দোলন সুরু করলেন, এক, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, দুই, নারীদের মুক্তি।

অস্পৃশ্যদের জন্যে অন্তরে বেদনা তাঁর চিরদিনই ছিল, এখন অবস্থা বুঝে তিনি তাদের ন্যায্য অধিকারের জন্যে সংগ্রাম সুরু করলেন। তিনি বল্লেন, আজ ভারতীয়েরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে হরিজনদের অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে, তবে তা' ভগবানের দেওয়া ন্যায্য দণ্ড।....যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুরা ইচ্ছে ক'রে

অস্পৃশ্যতাকে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ ব'লে মনে করবে, ততদিন পর্য্যন্ত স্বরাজ-লাভ সম্ভব হবে না। ভারত অপরাধী। আমরা আমাদের দুর্ব্বল ভাইদের প্রতি যে অন্যায় করেছি, যতক্ষণ তার প্রায়শ্চিত্ত না করি ততক্ষণ আমরা পশুর সমান।' গান্ধীজি অস্পৃশ্যদের সাদরে আহ্বান করলেন অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে। তাদের বল্লেন, তোমরা তোমাদের যোগ্যতার পরিচয় দাও, নব-জাগ্রত ভারত তোমাদের কাছে অনেক কিছুই আশা করে।

সমান উৎসাহের সঙ্গে তিনি নারীদের মুক্তির জন্যে এগিয়ে গেছলেন। ভারতের নারীরা অত্যন্ত পরাধীন। ভারতের পুরুষ যেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে তার শোধ নিয়েছে নারীদের ওপর—তাদের গৃহের মধ্যে বন্দী ক'রে রেখে, তাদের স্বাধীনতার সমস্ত পথ সমাজ শাসনের পাঁচীল দিয়ে ঘিরে রেখে। গান্ধীজি উদাত্তস্বরে বল্লেন, 'নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার, কেন নাহি দিবে অধিকার ?' তিনি বল্লেন, 'স্বরাজ কথার অর্থ হ'ল, আমরা ভারতের প্রত্যেকটি অধিবাসীকে নিজের ভাই ও ভগিনীর মত দেখ্‌ব। স্ত্রীজাতি দুর্ব্বলতর নয়, তাঁরা মানবজাতির শ্রেষ্ঠতর অর্দ্ধেক অংশ, মহত্তরও। এমনকি আজও তাঁরা ত্যাগ নীরব সহিষ্ণুতা ও মিলনের প্রতি-মূর্ত্তি।' নারীদের আহ্বান ক'রে বল্লেন, 'আপনারা আসুন, জনসাধারণের কাজে আত্মনিয়োগ করুন, বিপদের সম্মুখীন হ'য়ে আদর্শের জন্যে যন্ত্রণাভোগ করুন। শুধু বিলাস ত্যাগ

করলে বা বিলিতি জিনিষ পুড়িয়ে ফেল্লেই চল্‌বে না, পুরুষদের সঙ্গে সমস্যা ও ত্যাগের অংশও গ্রহণ করতে হবে।'

তাঁর ডাক বিফলে গেল না। তাঁর স্ত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে অনেক নারীই জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করলেন, হাসিমুখে কারাবাস বরণ ক'রে নিলেন।

কস্তুরীবাই গান্ধী

অসহযোগ আন্দোলন বেশীদিন একভাবে চল্‌ল না। রাজা-প্রজায় শত্রুতা বেড়েই চল্‌ছিল, সরকারের পাশবিক দমন-নীতির ফলে কোথায়-কোথাও বিদ্রোহের ভাব দেখা গেল। নাসিক জেলার মালিগাঁও-এ এবং বিহারের গিরিডিতে কিছু-কিছু দাঙ্গা হ'ল। ১৯২১ সালের মে মাসে আসামেও কয়েকটী সংঘর্ষ বাধলো। চা-বাগানের বারো হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করল— সরকার তাদের পেছনে গুর্খা-সৈন্য লেলিয়ে দিলেন। এর প্রতিবাদে পূর্ব্ববঙ্গে রেল ও ষ্টীমারের শ্রমিকরাও কাজ বন্ধ করল। গান্ধীজি এই চাঞ্চল্যকে যথাসাধ্য শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এই সব হিংসার্থক কাজের জন্যে গভর্ণমেণ্ট্ আলিভাইদের দায়ী করলেন। ফলে, মহম্মদ আলি ও শওকৎ আলিকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। তাঁদের শাস্তি হ'ল দু'বছরের জন্যে কারাবাস।

এই দণ্ড ভারতবাসীরা নতমস্তকে মেনে নিল না। ৪ঠা নভেম্বর দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রত্যেক প্রদেশকে আপন আপন দায়িত্বে ট্যাক্স্ বন্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে আইন অমান্য আন্দোলন করবার অধিকার দিলেন। সারা দেশ জুড়ে বিরাট আইন অমান্য আন্দোলনের তোড়-জোড় প'ড়ে গেল। এই সময় ১৭ই নভেম্বর প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ বোম্বেতে উপস্থিত হলেন।

মহম্মদ আলি ও শওকৎ আলি

আগেই ঠিক হয়েছিল, প্রিন্সকে ভারতের সর্ব্বত্র বয়কট করা হবে। বোম্বের সাধারণ লোক সে আদেশ পালন করল, কিন্তু

ধনী পার্শীরা সে-কথায় কর্ণপাত না ক'রে উৎসবে যোগ দিল। রাগে ও ক্ষোভে জনতা বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেল্‌লো। তারা ধনীদের দোকান জ্বালিয়ে দিল, বাসভবন আক্রমণ ক'রে বেপরোয়াভাবে লুটপাট চালালো—অত্যাচারের হাত থেকে স্ত্রী-পুরুষ কেহই বাদ পড়ল' না।

বোম্বের দাঙ্গার সংবাদ গান্ধীজির হৃদয়ে তীরের মত বিঁধল। তিনি মর্ম্মাহত হ'য়ে বুঝ্‌লেন, জনতা এখনো আইন অমান্যের জন্যে প্রস্তুত হয়নি। এই দাঙ্গার দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে নিলেন, এবং শাস্তিস্বরূপ প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন ক'রে অনশন অবলম্বন করলেন।

আমেদাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল, জনসাধারণ অহিংসার সত্যকার স্বরূপটী হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই আইন অমান্যের আশ্রয় নেয়া হবে। এই অধিবেশনের পরই কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা ছিল, তাই তাঁরা গান্ধীজির হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিলেন। তারপর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিশ হাজার নরনারী সানন্দে কারাবরণ করলেন। আরও হাজার হাজার নর-নারী মুক্তি-সংগ্রামে আত্মদান করবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে রইল।

আবার গান্ধীজির বিশ্বাস হ'ল ব্যাপকভাবে আইন অমান্য করবার উপযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। স্থির করলেন, বোম্বাই প্রদেশে বারদৌলি জেলায় আন্দোলন প্রথমে পরখ্‌ করা হবে। গান্ধীজি একটী খোলা চিঠিতে বড়লাটকে

জানালেন, যে গভর্ণমেণ্ট্ সংবাদপত্র, সভা-সমিতি এবং মত-প্রকাশের স্বাধীনতাকে নৃসংশভাবে দমন করেছে, তার বিরুদ্ধে বারদৌলিতে অহিংস গণ-বিদ্রোহের প্রথম সূচনা করা হবে। কিন্তু বড়লাটের কাছে চরম পত্র পাঠাবার পথে উচ্ছৃঙ্খল জনতা আবার বাধা হ'য়ে দাঁড়ালো।

গোরখপুর জেলার চৌরিচৌরায় একটী শোভাযাত্রার সঙ্গে সংঘর্ষে পুলিশ গুলি চালায়। কিন্তু জনতা থানা পর্য্যন্ত কনষ্টেব্‌ল্‌দেব তাড়া ক'রে যায়। তারপর থানায় আগুন লাগিয়ে পুলিশ কনষ্টেব্‌ল্‌দের জীবন্ত দগ্ধ ক'রে মারে।

এই দাঙ্গার খবর পেয়ে গান্ধীজির অন্তর বেদনায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠল, লজ্জায় তাঁর মাথা হেঁট হ'য়ে গেল। তিনি বল্লেন, 'ভাবতের হিংসাবাদীদের ওপর যখন অহিংস-অসহযোগীরা কর্ত্তৃত্ব লাভ করতে পারবে, কেবল তখনই আইন অমান্য আন্দোলন সফল হওয়া সম্ভব হবে।'

গান্ধীজির অনুরোধে কংগ্রেস আইন-অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করলেন।

অনেকদিন ধ'রেই গান্ধীজি আশা করছিলেন, তিনি হয়ত গ্রেপ্তার হবেন। এইবার সে-সম্বন্ধে গুজব বেশ জোরাল হ'য়ে উঠল। সমস্ত দরকারী কাজকর্ম্ম মিটিয়ে দিয়ে গান্ধীজি কারাবাসের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিলেন। শবরমতী আশ্রমে তিনি শান্তভাবে কনষ্টেব্‌ল্‌দের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কারাবাস তাঁর জীবনে নতুন নয়। তিনি জেলে যেতে ভীত নন, গভর্ণমেণ্ট্‌কেও তিনি ভয় করেন না। কিন্তু তাঁর আসল ভয়ের কারণ ছিল ভারতের জনসাধারণ। তিনি ভাব্‌ছিলেন, তাঁর গ্রেপ্তারের কথা শুনে হয়ত জনসাধারণ হঠাৎ হিংসায় উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌বে। তাই তিনি বল্লেন, 'আমি মনে-প্রাণে কামনা করি, জনসাধারণ পরিপূর্ণ আত্ম-সংযম পালন করবেন এবং আমার গ্রেপ্তারের দিনকে উৎসবের দিন ব'লে ভাব্‌বেন। গভর্ণমেণ্টের ধারণা সমস্ত আন্দোলনের মূলে আছি আমি এবং আমার অপসারণে দেশে আবার শান্তি ফিরে আসবে। কিন্তু তাঁরা জনসাধারণে শক্তির কথা এখনো জানেন না। আমার বিশ্বাস জনসাধারণ পূর্ণশান্তি রক্ষা ক'রে অহিংসা থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে গভর্ণমেণ্টের এই ভুল ধারণা ভেঙে দেবেন।'

১৯২২ সালের ১০ই মার্চ্চ রাত্রিতে অবশেষে কন্‌ষ্টেবল্‌দের আবির্ভাব ঘট্‌ল। গান্ধীজি গ্রেপ্তার হ'লেন। আট দিন পরে জজ্‌ ব্রুমফিল্ডের এজলাসে গান্ধীজির বিচার শুরু হ'ল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হ'ল, রাজদ্রোহিতা ও শান্তিভঙ্গ। এ-অভিযোগের তিনি যা' উত্তর দিলেন, আইন-আদালতের ইতিহাসে তা অমর হ'য়ে থাকবে। আজ পর্য্যন্ত কোন আসামী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এতখানি মহত্ত্ব ও মহানুভাবতার পরিচয় দিতে পারেনি।

তিনি বল্‌লেন, 'আমি চিরকাল হিংসা এড়াতে চাই—

আমার রক্তের প্রতিটী কণিকায় অহিংসা মিশে আছে। কিন্তু আমার সামনে মাত্র দু'টী পথ খোলা ছিল। এক মুখ বুঁজে হেঁট মাথায় আমার দেশের সর্ব্বনাশকর বৃটিশ শাসন মেনে নেওয়া, আর না হয় আমার দেশের জনতাকে বিশ্বাস করা, যে জনতা অনেক সময় ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে। আমি দ্বিতীয় পথটীই বেছে নিয়েছি। সুতরাং তার জন্যে শাস্তি আমার প্রাপ্য। বোম্বাই ও চৌরিচৌরার অপরাধের জন্য একমাত্র আমিই দায়ী। বিচারক, হয় আপনি পদত্যাগ করুন, না হয় আমায় কঠিন শাস্তি দিন।'

বিচারে গান্ধীজির ছ'বছরের কারাদণ্ড হ'ল।

জনতা অক্ষরে অক্ষরে তাঁর আদেশ পালন করল'। দেশের কোথাও কিছুমাত্র শান্তি ভঙ্গ হ'ল না। দু'বছর জেলে থাক্‌বার পর গান্ধীজি অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হ'ন। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট্ বাধ্য হ'য়ে তাঁকে ছেড়ে দেন।

এর পর কয়েক বছর গান্ধীজি রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে দূরেই রইলেন। তখন আন্দোলনের কোন প্রশ্নই ছিল না। কংগ্রেস তখন শাসন-পরিষদে যোগ দিয়ে আইনতঃ ইংরেজদের বিরোধিতা করার পক্ষপাতী। সুতরাং গান্ধীজি আশ্রমে থেকে দেশের লোককে সংগঠনমূলক কাজ-কর্ম্ম করবার উপদেশ দিলেন।

কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট থাক্‌লেও তাঁর শেখানো-পন্থা সত্যাগ্রহের ব্যবহার বন্ধ হ'ল না। কোন কিছু অন্যায়ের

প্রতিকার করবার দরকার হ'লেই লোকে সত্যাগ্রহ করতে লাগ্‌ল।

গান্ধীজির প্রভাবে শিখদের আকালি সম্প্রদায় তাদের ধর্ম্মস্থানগুলি শুদ্ধ করতে চাইল কিন্তু ধর্ম্মস্থানগুলির কুখ্যাত রক্ষকেরা তা সহ্য করবে কেন? গভর্ণমেণ্ট্ ও রক্ষকদেব সাহায্য করতে এগিয়ে এল। প্রত্যেক দিন দলে দলে লোক গুরু কা-বগে শহীদ্ হ'তে লাগ্‌ল। তাদের ভেতর কারুর যুদ্ধে যাবার বয়েস হয়েছে, কেউ বা যুদ্ধফেরত। তাবা শপথ গ্রহণ করল; চিন্তায় বা কাজে কখনো তারা অহিংসার মন্ত্র বিস্মৃত হবে না। প্রতিদিন একদল এই শপথ গ্রহণ ক'রে ধর্ম্মস্থানের দিকে এগিয়ে চল্‌ল—মাথায় তাদেব কালো পাগড়ীতে সাদা ফুলের মালা জড়ানো। কাছেই পুলিশ ঘাঁটি কবেছিল—তারা লোহার গুল লাগানো লাঠি দিয়ে সত্যাগ্রহীদের আক্রমণ করল। কঠিন আঘাতে কেউ কেউ মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল'। যারা উঠে দাঁড়াতে পারল' তারা আবার একমনে প্রার্থনায় রত হ'ল। প্রহারের চোটে অজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত প্রার্থনা বন্ধ হ'ল না। কিন্তু একবারের জন্যেও কারও মুখ দিয়ে সামান্য একটি যন্ত্রনা কাতর শব্দ বেরোল' না, কারও চোখে সামান্য একটু ক্রোধর ছায়া পড়ল না। শিখরা যোদ্ধার জাত যুদ্ধ করা তাদের ধর্ম্মের অঙ্গ। যে মন্ত্র তাদের এতখানি সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল করতে পারে, সে মন্ত্রের কতখানি ক্ষমতা!

ভাইকম, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একটী গ্রামের নাম। সেখানে অস্পৃশ্যদের শুধু যে মন্দিরে প্রবেশ করবার অধিকার ছিল না, তা'নয়—মন্দিরের সামনের রাস্তা দিয়ে পর্য্যন্ত তাদের যাবার হুকুম ছিল না। কেউ কেউ গান্ধীজির প্রেরণায় এ-অন্যায় প্রথার প্রতিবাদ করল'। তা'তে কোন ফল না হওয়ায় তারা ঠিক করল, সত্যাগ্রহের আশ্রয় নেবে। স্বেচ্ছাসেবকরা অস্পৃশ্যদের সঙ্গে নিয়ে রোজ সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত আরম্ভ করল। গোঁড়া ব্রাহ্মণরা আঁৎকে উঠ্ল। তারা আর্ত্তনাদ করল, 'মহারাজ, আপনি থাক্তে ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের এ অপমান সহ্য করতে হবে ?' সুতরাং ত্রিবাঙ্কুরের রাজা পুলিশের দলবল পাঠিয়ে দিলেন। পুলিশ প্রথমে লাঠি চালিয়ে সত্যাগ্রহীদের ভয় দেখাতে চেষ্টা করল। কিন্তু হিংসার নিগ্রহে অহিংসার ক্ষমতা বেড়ে যায়। পুলিশ যত লাঠি চালায়, সত্যাগ্রহীদের দল তত বেড়ে যায়। শেষ পর্য্যন্ত উপায়ান্তর হ'য়ে রাস্তার দু'মোড়ে ব্যারিকেড্ খাড়া করা হ'ল এবং বহু পুলিশ তা পাহারা দিতে লাগ্ল। স্বেচ্ছাসেবকরা এ-অবস্থায় কি করতে পারে ? গান্ধীজি উপদেস দিলেন, ব্যারিকেড্ ভাঙতে চেষ্টা কর'না, ধারে দাঁড়িয়ে একমনে প্রার্থনা কর। বেশ কিছুদিন এই ভাবে যাবার 'পর রাজা পুলিশ-সাহায্য প্রত্যাহার করলেন—ব্রাহ্মণরাও বেগতিক দেখে পেছু হট্ল।

গান্ধীজি ভারতের মাটীতে যে সত্যাগ্রহের বীজ ছড়িয়ে

ছিলেন, এইভাবে এখানে ওখানে সেই বীজ থেকে চারাগাছ জন্মগ্রহণ করতে লাগল।

বেশীদিন অবশ্য রাজনীতি থেকে দূরে থাকা চলল না। ১৯২৭ সালের শেষাশেষি ভারতের রাজনৈতিক জগতে আবার কিছুটা আলোড়নের সম্ভাবনা দেখা গেল।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গান্ধীজি ভাইসরয়ের কাছ থেকে বিশেষ জরুরি এক আমন্ত্রণ পেলেন। তখন তিনি দিল্লী থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে। অন্যকাজ বন্ধ রেখে গান্ধীজি তখনই দিল্লী যাত্রা করলেন। ভাইসরয় লর্ড আরুইনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল।

লর্ড আরুইন সাইমন-কমিশন্ সংক্রান্ত ভারত-সচিবের উক্তি গান্ধীজিকে পড়তে দিলেন। গান্ধীজি তা'পাঠ ক'রে বিস্মিত মুখে প্রশ্ন করলেন, 'শুধু এই জন্যে ডেকেছিলেন?'

ভাইসরয় ঘাড় নেড়ে বল্লেন, 'হ্যাঁ।'

গান্ধীজির এইবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌ল, 'সামান্য এই কথাটা জানাবার জন্যে আমায় হাজার মাইল দূর থেকে টেনে আন্‌লেন? কেন, সামান্য এক-আনার খামে এ-খবরটা পেতে পারতুন না?'

ভাইসরয়ের অস্বস্তিকর ভাব দেখে বোঝা গেল, তিনি শুধু ওপর-ওলার আদেশ পালন করছেন। গান্ধীজির অসন্তোষের কারণ ছিল। সাইমন-কমিশনের উদ্দেশ্য হ'ল, ভারতে ঠিক কি ধরণের শাসন ব্যবস্থা কার্য্যকরী হবে এবং ঠিক কত খানি

শাসন-ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, সে-বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন-নেতার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা। কংগ্রেস এবং গান্ধীজি নিজেও অনেক দিন ধ'রেই ভারতের জন্যে স্বাধীনতা চেয়ে আস্‌ছেন। তাঁরা বার-বার বলেছেন, কি রকম শাসনের বন্দোবস্ত করা হবে তা' ভারতবাসীরা নিজেরাই ঠিক করবে। তার পরেও অজ্ঞতার ভান ক'রে এই-রকম একটা কমিশন পাঠানো দস্তুরমত অপমানকর রসিকতা।

গান্ধীজির পরামর্শে সর্ব্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস সাইমন-কমিশনকে বয়কট করতে মনস্থ করলেন। বয়কট আরম্ভ হ'ল কমিশনের ভারতে পৌঁছান'র দিন দেশব্যাপী হরতাল দিয়ে। কমিশন প্রথমে গেল দিল্লীতে। বিরাট শোভাযাত্রা তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে কালো পতাকা হাতে নিয়ে চল্‌ল,—পতাকায় লেখা 'Go back Simon' বয়কটের রকম-সকম দেখে পুলিশ বলপ্রয়োগ সুরু করলো। লাহোরে শোভাযাত্রার ওপর অকারণে ভীষণভাবে লাঠি-চার্জ্জ করা হ'ল। লক্ষ্ণৌতেও একই ব্যাপার ঘট্‌ল। পুলিশের অত্যাচারে কয়েকজন দেশ-নেতাও আহত হলেন। লক্ষ্ণৌতে একটা মজার ব্যাপার ঘট্‌ল। কাইজারবাগের চারিদিক হাজার-খানেক পুলিশ দিয়ে ঘিরে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরা সাইমন-কমিশনকে একটি পার্টি দিল। যাদের কংগ্রেসের লোক ব'লে মনে হ'ল, তাদের পুলিশ বাগের কাছে রাস্তাতেও আস্‌তে দিল না।

কিন্তু এত সাবধানতা একেবারে বিফলে গেল। পার্টি বেশ জমে উঠেছে এমন সময় আকাশ থেকে অসংখ্য কালো ঘুঁড়ি ও বেলুন এসে হাজির হ'ল—তাদের গায়ে স্পষ্ট ক'রে লেখা 'Simon, go back,' 'India for Indians,' ইত্যাদি। পাটনা, কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই সর্ব্বত্রই বয়কট সম্পূর্ণভাবে সফল হ'ল। কয়েকজন রাজভক্ত প্রজার সঙ্গে আলাপ ক'রে সাইমন কমিশন ফিরে গেল।

সাইমন-কমিশন যাওয়ার কয়েক মাস পরেই এক অপরূপ ঘটনা ঘট্‌ল। যে বারদৌলিতে দু'বার আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করতে গিয়ে গান্ধীজি থেমে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই বারদৌলি এবার আইন অমান্য সুরু করল।'

বারদৌলিতে প্রতি কুড়ি-তিরিশ বছর অন্তর নতুন ক'রে জমি বিলি করবার নিয়ম ছিল। এই সময় সাধারণতঃ শতকরা ২৫ ভাগ ক'রে খাজনা বাড়ানো হ'ত। এ-বছর জমি বিলির সময় যখন নিয়মমত খাজনা বাড়ানোর কথা উঠ্‌ল, কৃষকরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তার প্রতিবাদ করল। তারা বল্‌লে, জমির খাজনা বাড়াবার অধিকার গভর্ণমেণ্টের নেই; কারণ জমির ফসল যদি ভাল হ'য়ে থাকে ত তার মূলে আছে কৃষকদেরই অর্থ এবং শ্রম। তা'ছাড়া, তাদের বেশী খাজনা দিতে আপত্তি ছিল না; তারা শুধু চেয়েছিল, একটি পক্ষপাতিত্বশূন্য তদন্ত কমিটি বসিয়ে ঠিক করা হোক, ন্যায্যতঃ কতখানি খাজনা বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু সামান্য কৃষকদের যুক্তি শোনবার

সময় কোথায় গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতায় অন্ধ হ'য়ে শতকরা পঁচিশ ভাগ খাজনা বৃদ্ধিই ধার্য্য করলেন। কিন্তু বারদৌলির কৃষকদের চিনতে তাঁদের তখনও বাকী ছিল।

কৃষকরা দলবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত করল, তারা এ অবিচার মেনে নেবে না, তারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করবে। তাদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্যে তারা বল্লভভাই প্যাটেলকে আমন্ত্রন করল'। প্যাটেল তাদের সত্যাগ্রহের রীতি-নীতি ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে তাদের দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ করলেন। খাজনা দেওয়া বন্ধ হ'ল—গভর্ণমেণ্ট্ আরম্ভ করলেন দমন। প্রথমে তাঁরা কৌশলের সাহায্যে হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের মধ্যে দলাদলির মনোভাব জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তা'তেও কোন ফল হ'ল না দেখে তাঁরা হিংস্র-প্রকৃতির পাঠান-সৈন্যদের আমদানী করলেন। তারপর পাঠানরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে নানা অত্যাচারে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে লাগল; কিন্তু কৃষকরা সত্যাগ্রহ বন্ধ করল' না। কতজনের কারাদণ্ড হ'ল, কতজন গুরুতররূপে আহত হ'ল। কৃষকদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোধ করা হ'ল,। পাঠানরা কুটীরে কুটীরে ঢুকে গরু-মোষ ক্রোক ক'রে নিল। সে-সময় এ নিয়ে একটা ছড়াও ছেলেরা সুর ক'রে গাইত:

Pathans to the right of them
Pathans to the left of them
Marched the Buffalo Brigade.

ছ'মাস ধরে আন্দোলন চল্‌ল। শেষ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট আপোষ করতে রাজী হলেন। যারা জেলে ছিল তাদের মুক্তি দেওয়া হ'ল বজেয়াপ্ত সম্পত্তি কৃষকরা ফেরত পেল এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করা হ'ল। গভর্ণমেণ্ট একটী তদন্ত কমিশন বসালেন। কমিশন অভিমত প্রকাশ করল', শতকরা বাইশ টাকা খাজনা বৃদ্ধিকে লুট ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। খাজনা বৃদ্ধির হার ঠিক হ'ল শতকরা ৬¼ ভাগ। কৃষকদের যন্ত্রনা-ভোগ বিফল গেল না।

বারদৌলির সত্যাগ্রহই ভারতব্যাপী দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলনের ভূমিকা।

এই সময় গান্ধীজি ইউরোপে ভ্রমণ করবার জন্যে নিমন্ত্রিত হলেন। কিন্তু তখন তাঁর যাবার উপায় ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন, ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় বিদেশ যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। তা' ছাড়া তাঁর মত ছিল, স্বাধীন ভারতের প্রতিধিরূপেই তিনি ইউরোপে যেতে পারেন, তা'না হ'লে নয়।

১৯২৯ সালের শেষাশেষি লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল। কংগ্রেস গান্ধীজির অধিনায়কত্বে ঘোষণা করল, ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী রবিবার ভারতের সর্ব্বত্র স্বাধীনতা-দিবস পালন করা হবে। প্রকাশ্য-সভায় দেশের লোক নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করবে, আমরা বিশ্বাস করি, ভারতবাসীর স্বাধীন হবার এবং

স্বাধীনতাজনিত সুখ-সুবিধা উপভোগ করবার ন্যায্য অধিকার আছে। যে গভর্ণমেণ্ট এই অধিকার অস্বীকার করে, তাকে পাল্টে দেবার অধিকার প্রত্যেকের আছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে ইংরেজ আমাদের এত বেশী শোষন করেছে, যে আজ আমাদের গ্রামে-গ্রামে দুর্ভিক্ষ, ঘরে ঘরে অনাহার। রাজনৈতিক দিক থেকে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ কম নয়—স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা বলবার বা একসঙ্গে মিলিত হবার অধিকার ইংরেজ হরণ ক'রে নিয়েছে। সংস্কৃতির দিক থেকে ইংরাজি শিক্ষা আমাদের দেশের মাটী থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে প্রভুর পদলেহন করতে শিখিয়েছে। আত্মনৈতিক দিক থেকে ইংরেজ আইনের জোরে আমাদের হাত থেকে সমস্ত অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমাদের এতখানি মনুষ্যত্বহীন ও কাপুরুষ ক'রে তুলেছে যে, চোর ডাকাত গুণ্ডার হাত থেকে সম্পত্তি ও পুত্র-পরিবার রক্ষা করবার শক্তি ও সাহস আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এইভাবে চতুর্দিক থেকে ইংরেজ আমাদের যে সর্ব্বনাশ করছে আমরা আর তা' সহ্য করতে রাজী নই। আমরা জানি, আমাদের লুপ্ত অধিকার ফিরে পাবার সবচেয়ে কার্য্যকরী পন্থা, অহিংসা। সুতরাং আমরা গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা বন্ধ করব, এবং কর দেওয়া বন্ধ ক'রে আইন অমান্যের জন্যে প্রস্তুত হব।

অদ্ভুত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে দেশব্যাপী স্বাধীনতা-দিবস প্রতিপালিত হ'ল। স্পষ্ট বোঝা গেল, কয়েক বছরের নিষ্ক্রিয়তায় জনসাধারণের দেশপ্রেম ক্ষুণ্ন হয়নি। ভারতের

জনসাধারণ যেন কৃত্রিম-শান্তির ভাবে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে।

গান্ধীজির অন্তরাত্মা ব'লে উঠল শুভক্ষণ এসেছে।

১৯৩০ সালের ২রা মার্চ্চ গান্ধীজি বড়লাট আরুইনকে ১১ দফা চরম-পত্র প্রেরণ করলেন। এই পত্রে কয়েকটি দাবী ছিল, আইন ক'রে মদ্যপান বন্ধ করতে হবে, জমির খাজনা অর্দ্ধেক কমিয়ে দিতে হবে, সৈন্য-বিভাগের খরচ অর্দ্ধেক করতে হবে, লবণ-কর তুলে দিতে হবে; বিদেশী কাপড়ের শুল্ক বৃদ্ধি করতে হবে, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের ছেড়ে দিতে হবে, সি-আই-ডি বিভাগ তুলে দিতে হবে, এবং আত্মরক্ষার উপযোগী আগ্নেয়াস্ত্রের জন্যে লাইসেন্স দিতে হবে। এই দাবীগুলি যদি বড়লাট মেনে না নেন্, তবে লবণ-আইন অমান্য করা সুরু হবে।

এই লবণ করের একটা ইতিহাস আছে। ভারতবাসীদের শোষণ করবার উপায়-স্বরূপ ইংরেজরা চিরকাল ভারতে যত জিনিষ আমদানী করেছে, তার চেয়ে ঢের বেশী ভারত থেকে রপ্তানী করেছে। আমদানীর নমুনাও বেশ মজার। আগে, এখন যেখানে চৌরঙ্গী রোড্ সেখানে একটা খাল ছিল। এই খাল বুঁজিয়ে রাস্তা করবার ব্যবস্থা হ'ল। তার জন্যে মাটী চাই। মাটী কি ভারতে পাওয়া যায় না? তা'হয়ত যায়, কিন্তু লিভারপুলকে অনেক জাহাজ মালের অভাবে প'ড়ে আছে। সুতরাং আমাদের কলিকাতার চৌরঙ্গী গড়বার

জন্যে জাহাজ ভর্ত্তি ক'রে লণ্ডনের ষ্ট্র্যাণ্ড্ থেকে মাটী এল। লবণ আইনের মূলেও ছিল এই ধরণের স্বার্থপরতা। সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরী ক'রে ভারতবাসী বহুদিন ধ'রে নিজেদের অভাব মিটিয়ে আস্ছে। কিন্তু তা'তে বিলিতি লবণ-ব্যবসায়ীদের কি? তারা চায়, ভারতবাসী তাদের কাছ থেকে লবণ কিনুক। সুতরাং তাদের সুবিধার জন্যে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট্ দিশি লবণের ওপর ট্যাক্স্ বসালেন।

গান্ধীজি এই লবণ-করের তীব্র সমালোচনা করেছেন বহুবার। এইবার ঠিক করলেন, এই আইন অমান্য করবেন। গান্ধীজির চিঠির উত্তর বড়লাট যা দিলেন, তা' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও রূঢ়।

সেই উত্তর পেয়ে গান্ধীজি বল্লেন, 'আমি নতজানু হ'য়ে খাদ্য চেয়েছিলুম, তার বদলে পেলুম এক খণ্ড পাথর। ইংরেজ-জাত শুধু হিংসারই বশ হয়। ভারতবাসী যে শান্তি জানে, তা' কারাগারের শান্তি। যে আইনের ফলে এই অবস্থা সম্ভব হয়েছে, সে-আইন ভঙ্গ করা আমি কর্ত্তব্য ব'লে মনে করি।' গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলনকে অহিংসার পথে নিয়ে যাবার একটা উপায় উদ্ভাবন করলেন। ঠিক হ'ল, তিনি প্রথম সমুদ্রতীরে গিয়ে লবণ আইন অমান্য করবেন। আর সকলে তখনকার মত চুপচাপ থাক্‌বে, কিন্তু আন্দোলনে যোগ দেবার জন্যে নিজেদের প্রস্তুত রাখ্‌বে। যে মুহূর্ত্তে গান্ধীজি গ্রেপ্তার হবেন, সেই মুহূর্ত্ত থেকে ভারতের সর্ব্বত্র লবণ-আইন অমান্য করা সুরু হবে। জনসাধারণকে কোন আদেশ দেবার

প্রয়োজন নেই—তারা তাদের বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করবে। ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ্চ গান্ধীজি সবরমতী আশ্রম থেকে যাত্রা সুরু করলেন। সঙ্গে তাঁর ৭৯ জন পদচারী। উদ্দেশ্য, দু'শ মাইল দূরে সমুদ্রতীরে ডাণ্ডিতে পৌঁছে লবণ আইন অমান্য করবেন। গান্ধীজির এই ডাণ্ডি যাত্রার দিনগুলি মহাকালের জপের মালায় অক্ষয় হ'য়ে থাক্‌বে।

এ যেন বাস্তব নয়, কল্পনা। এ যেন ইতিহাস নয়, মহাকাব্য।

একটী মানবাত্মা যেন চলেছে তার পরম তীর্থের সন্ধানে ডাণ্ডি অভিমুখে—যে ডাণ্ডি শুধু সমুদ্রতীরের একটী ক্ষুদ্র গ্রাম নয়, যে ডাণ্ডি পৃথিবীর ম্যাপে নেই, যার স্থান বাস্তব ছাড়িয়ে, পরমাত্মার গভীরতম দেশে।

ডাণ্ডির পথ ভারতের স্বাধীনতার পথ, মানবের স্বপ্নের পথ, অনাগত ভবিষ্যতের পথ।

অপূর্ব্ব বিদ্রোহী পদচারীদের জয়যাত্রা। হাতে তাদের অস্ত্র নেই, শত্রুকে নিরস্ত্র করার জন্যে আছে অন্তরে মন ও করুণা। যুদ্ধের নীতি তাদের অহিংসা, রীতি সত্যাগ্রহ।

আমেদাবাদের পথ-ঘাট লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেল। কোথাও আর তিল ধারণের স্থান নেই। বাড়ীর ছাদ, পাঁচীল, পথের ধারের গাছপালা সমস্ত ভর্ত্তি হ'য়ে উঠ্‌ল। পথের দু'ধার পুষ্প-পতাকায় সুসজ্জিত করা হ'ল। মাঝখান দিয়ে গান্ধীজি তাঁর সহযাত্রীদের সঙ্গে এগিয়ে চল্‌লেন। শ্রদ্ধাবনত

বদ্ধাঞ্জলি জনতা বিস্মিত-দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মাঝে-মাঝে শুধু রব শোনা যেতে লাগল 'গান্ধীজি কি-জয়!' 'মহাত্মাজী কি-জয়'!

তখন ফাল্গুনের শেষাশেষি। গুজরাটের বালুময় উষর পথে মধ্যাদিনের বায়ু উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে হাহাকার করছে। কোথাও আশ্রয় নেই, ছায়া নেই, জল নেই। পাখীর গান স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। তরুহীন প্রান্তরের কোণে দিক্‌চক্রবাল যেন রৌদ্রদাহে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। সেই পথ দিয়ে চলেছেন একটী ষাট-বছরের বৃদ্ধ—নগ্নপদ, মুণ্ডিত-শীর্ষ, ভর দেবার জন্যে হাতে আছে শুধু একটী লাঠি।

গান্ধীজি এক পা এক পা ক'রে এগোন, আর শতাব্দীর ঘুম টুটে যায়। এক পা এক পা ক'রে এগোন, আর ভারতবাসীর মন থেকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ঝন্‌-ঝন্‌ ক'রে খ'সে পড়ে। তাঁর পদাঘাতে কত ধূলি-কণা বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়ে। সেই ধূলিকণা বাতাসে-বাতাসে ভারতের দিকে-দিকে ছড়িয়ে যায়। তারা বহন ক'রে আনে কত আশ্বাস, কত আশার বাণী। সুপ্ত দেশপ্রেম হঠাৎ আঁখি মেলে যেন উদ্দাম হ'য়ে উঠ্‌ল। গ্রামে গ্রামে গৃহে-গৃহে জন্মালো লাখ-লাখ কোটি-কোটি সত্যাগ্রহী। দু'শ মাইল যাত্রাপথের ধারে ধারে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোক এসে জড় হ'ল গান্ধীজির দর্শন-লাভের আশায়।

কেউ কেউ প্রশ্ন করল, 'এই যাত্রার কষ্ট কি আপনার সহ্য হবে, মহাত্মাজী?'

গান্ধীজি উত্তর দিলেন, 'না হ'লে ক্ষতি কি। না হয় এই যাত্রাই আমার জীবনের শেষযাত্রা হবে।' কেউ হয়ত প্রশ্ন করল, 'কবে আপনি আশ্রমে ফিরবেন?'

'যতদিন না লবণ-আইন বদ হয়, ততদিন আর আশ্রমে ফিরে যাব' না'!

গান্ধীজির ডাণ্ডি-যাত্রা সম্বন্ধে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন, 'গান্ধীজির ঐতিহাসিক যাত্রা যেন মোজেসের নেতৃত্বে ইজরায়েলের অধিবাসীদের যাত্রার মত। যতদিন না অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবেন, ততদিন এ-যাত্রা বন্ধ হবে না।'

তিনি যদি গ্রেপ্তার হন, তবে লোকে কি করবে, গান্ধীজি তাও ভাল ক'রে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন।

'কিন্তু আমরা কি শুধু লবণ তৈরী করব?'

গান্ধীজি বল্লেন, 'শুধু তা' নয়, যেখানে-যেখানে লবণের ডিপো আছে, সেখান থেকে দল বেঁধে গিয়ে লবণ তুলে নিয়ে আস্‌বে।'

'কিন্তু তা'ত চুরি করা হবে, লুট করা।'

'না, তা'হবে না। কারণ এ লবণ ত তুমি নিজের জন্যে আন্‌ছ না।'

গান্ধীজির এই যাত্রায় বিশ্বে কি প্রতিক্রিয়া হ'ল? প্রথমে পৃথিবীর লোকে করলে উপহাস, তারপর তারা আকৃষ্ট হ'ল, তারপর হ'ল বিস্মিত ও মুগ্ধ।

৫ই এপ্রিল অভিযাত্রীদের দলসহ গান্ধীজি ডাণ্ডিতে

পৌঁছলেন। তার পরদিন সকালে প্রার্থনার পর গান্ধীজি ও তাঁর সাথীরা সমুদ্রতীরে প'ড়ে-থাকা লবণ কুড়িয়ে নিলেন। লবণ-আইন ভঙ্গ হ'ল। এই সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সারা ভারত জুড়ে লবণ-সত্যাগ্রহ সুরু হ'য়ে গেল। সমস্ত বড় বড় সহরেই বিরাট-বিরাট সভা ক'রে কার্য্যসূচী প্রস্তুত করা হ'ল। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় পিছাবনি এবং তমলুক মহকুমায় নরঘাটে ও কলিকাতার সন্নিকট চব্বিশ পরগণার মহিষবাথানে সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হ'য়ে গেল। তারপর করাচী, সিরোদা ধরাসনা, পাটনা, পেশোয়ার, কলিকাতা, মাদ্রাজ, সোলাপুর প্রভৃতি যায়গায় যে সব ঘটনা ঘটল' তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল, ভারত গভর্ণমেণ্ট নামেই শুধু সভ্য-দেশীয়, আসলে তার আপাত-সভ্যতার আড়ালে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আরণ্যক হিংসা। পেশোয়ারে মিলিটারিদের গুলিতে অনেক স্বেচ্ছাসেবক প্রাণ হারালো। মাদ্রাজেও কয়েকবার গুলি চল্‌লো। করাচীতে ১৭।১৮ বছরের বালকরাও পুলিশের গুলি খেয়ে মৃত্যু-বরণ করলো। বাংলাদেশেও অত্যাচার কিছু কম হ'ল না। তমলুকের থেরাই গ্রামে পুলিশ একটী স্ত্রীলোককে বিনাকারণে ভীষণ প্রহার করে। গ্রামের যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তারা শাঁক বাজিয়ে অন্যান্য সকলকে সঙ্কেত জানায়। ফলে, প্রায় পাঁচ ছ' হাজার লোক জড় হয়। পুলিশ তাই দেখে উন্মত্তের মত

জনতার ওপর গুলি চালায়। গুলিতে দশজন মারা যায় এবং আরও অনেকে নিহত হয়। কিন্তু কাঁথি মহকুমার এগ্রাথানার চোরপলিয়াতে যে ঘটনা ঘট্‌ল, তার তুলনায় অন্য-সমস্ত অত্যাচার ম্লান হ'য়ে যায়। চোরপলিয়ার একজন মীরজাফর জাতীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান পাশের গ্রামের লোকদের ভুলিয়ে একটা সরুপথে চোরপলিয়াতে নিয়ে যায়। রাস্তার দু'পাশে পালাবার কোন যায়গা নেই—কাছেই একটা পুকুর। পুলিশ হঠাৎ সামনে এসে তাদের ট্যাক্‌স্ দিতে বলে। তারপর অনবরত তাদের ওপর লাঠি চালাতে থাকে। পুকুরে ঝাঁপ দিয়েও নিস্তার নেই—পুলিশ পাড় থেকে লাঠির ঘা মারতে থাকে। ফলে পাঁচজন লোক জলমগ্ন হয়। এইভাবে শ্বাসরোধকারী নানা অর্ডিনান্স বাংলা দেশের বুকে চেপে বস্‌ল'।

গান্ধীজি লিখলেন, 'গভর্ণমেন্ট্ যদি লবণ-কর তুলে না নেন তবে তাঁরা দেখতে পাবেন দলে দলে লোক গুলি খাবার জন্যে বুক পেতে এগিয়ে চলেছে।'

গান্ধীজি ভাইস্‌রয়কে আবার একখানা চিঠি লিখলেন। তিনি জানালেন, শীঘ্রই তিনি ধার্‌সানা এবং চারসাদায় লবণের ডিপো আক্রমণ করতে যাবেন।

গভর্ণমেন্ট্ আর অপেক্ষা করতে পারল' না। এইবার গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা হ'ল। রাত্রি একটা বেজে দশ মিনিটের সময় পুলিশ এল। পুলিশ পরিবৃত হ'য়ে মোটর লরীতে ক'রে গান্ধীজি কারাগার যাত্রা করলেন।

গান্ধীজির পেছনে যারবেদা কারাগারের দ্বার রুদ্ধ হ'য়ে গেল।

কিন্তু গভর্ণমেণ্টের হিসেবে ভুল হ'ল। দেখা গেল, মুক্ত গান্ধীর চেয়ে বন্দী গান্ধী অনেক বেশী বিপজ্জনক। গান্ধীজির নীরব বাণী যেন কারাগারের রুদ্ধদ্বার ভেদ ক'রে দেশবাসীকে সত্যাগ্রহের আহ্বান জানালো।

গান্ধীজির গ্রেপ্তারের পরদিন ভারতের সর্বত্র হরতাল পালন করা হ'ল। কয়েক জায়গায় পুলিশ শোভাযাত্রার ওপর গুলি চালালো। তারপর লবণের ডিপো আক্রমণ কার্য আরম্ভ হ'ল।

২১শে মে প্রায় আড়াই হাজার স্বেচ্ছাসেবক ধারসানা লবণের ডিপোর কাছে জড় হ'ল। তাদের নেতা ছিলেন বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ ইমাম সাহেব। অতি প্রত্যূষে স্বেচ্ছাসেবকরা দল বেঁধে লবণের স্তূপ আক্রমণ করল। পুলিশ প্রস্তুত হয়েই ছিল। লাঠি হাতে তারা সুসংবদ্ধ জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যতবার স্বেচ্ছাসেবকরা এগোতে যায়, ততবার পুলিশের লাঠিতে সম্মুখবর্ত্তীরা আহত হয়, বাকী লোক পেছিয়ে আসে। এইভাবে দু'ঘণ্টা ধ'রে আক্রমণ চলে। তারপর পুলিশ নেতাদের গ্রেপ্তার করল। এইদিন পুলিশের লাঠি চার্জের ফলে প্রায় দু'শ নব্বই জন স্বেচ্ছাসেবক আহত হয়। দু'জন পরে মারা যায়। ওয়াদালাতেও পর পর কয়েকটি আক্রমণ চালানো হয়। ১লা জুন প্রায় পনের হাজার

স্বেচ্ছাসেবক ওয়াদালার লবণ-ডিপো আক্রমণ করতে যায়। তাদের ভেতর অনেক নারী ও শিশুও ছিল। পুলিশ লাঠি হাতে উন্মত্তের মত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে থাকে। সে দৃশ্য অবর্ণনীয়। যে-সব বিদেশী ইউরোপীয় সংবাদদাতারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা বেশীক্ষণ এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে পারেননি। লজ্জায় বেদনায় তাঁরা চোখে হাত চাপা দিতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। কিন্তু জনতা এরকম অত্যাচারেও ধৈর্য্য হারায়নি, অহিংসার পথ থেকে একটুও বিচলিত হয়নি।

সানিকাট্টা লবণের ডিপোতেও এই রকম আক্রমণ চলল। পুলিশের লাঠিতে অনেকে আহত হ'ল, অনেককেই গ্রেপ্তার করা হ'ল, তবু শেষ পর্য্যন্ত জনতা হাজার-হাজার মণ লবণ আহরণ ক'রে নিয়ে যেতে সক্ষম হ'ল।

১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ লোক কারারুদ্ধ হ'ল।

গভর্ণমেণ্ট এইবার সন্ধি করবার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে উঠলেন। প্রথম সঙ্কেত স্বরূপ গান্ধীজি মুক্তি পেলেন। তারপর প্রায় একমাস ধ'রে আলাপ আলোচনার পর ১৯৩১ সালের ৫ই মার্চ্চ গান্ধী-আরুইন চুক্তি সই করা হ'ল। এই চুক্তির ফলে সমস্ত অর্ডিনান্স্ রদ করা হ'ল, সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে ঠিক হ'ল এবং লবণ-আইন অনেকখানি শিথিল করা হ'ল, যাতে গরীব লোকেরা নির্ঝঞ্ঝাটে অনায়াসে ইচ্ছামত লবণ তৈরী ও বিক্রী করতে পারে।

[illegible] উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর উৎসাহপূর্ণ বাণী

কয়েক মাস পরে গোল-টেবিল-বৈঠকে যোগ দেবার জন্যে গান্ধীজি বিলেত যাত্রা করলেন। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের বিভিন্নদলের নেতারা একত্রিত হ'য়ে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে একটা শাসন ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করবেন।

লণ্ডন সহরের যে অংশে গরীবলোকেরা থাকে, সেই ইষ্টএণ্ডে গান্ধীজি আশ্রয় নিলেন। স্যাণ্ডাল পায়ে খাটো ধুতী প'রে খালি গায়ে চাদর জড়িয়ে গান্ধীজি রোজ সকালে বেড়াতে বেরোতেন। ইষ্ট্ এণ্ডের গরীব ছেলেরা দৌড়ে আসত Uncle Gandhi-র সঙ্গে খেলা করতে। বিলেতে তিনি বড়লোকদের কাছ থেকে যেমন নিমন্ত্রণ পেলেন, তেমনি পেলেন গরীবদের কাছে। তবে স্বভাবতঃই গরীবদের তিনি পছন্দ করতেন। লণ্ডন সহরের প্রচণ্ড শীতেও তিনি এক পোষাক পরেই কাটিয়ে দিলেন। এমন কি ঐ পোষাকে তিনি বাকিংহাম প্যালেসে গিয়ে পঞ্চম জর্জ্জের সঙ্গেও দেখা ক'রে এলেন।

কিন্তু যে জন্যে তিনি বিলেত গেছলেন তার ফল ভাল হ'ল না। গোল টেবিল বৈঠকে কোন রকম চলনসই গোছের ঐক্যও প্রতিষ্ঠা করা গেল না; শূন্যহাতে গান্ধীজি বিলেত থেকে ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যে ভারতের বড়লাট বদল হয়েছে। আরুইনের যায়গায় এসেছেন উইলিংডন। তিনি যেন ভারতে এসেই উঠে প'ড়ে প্রমাণ করতে লেগে গেলেন যে, তিনি উইলিংডন, আরুইন নন্। গান্ধী আরুইন চুক্তি ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রিতে

নিক্ষিপ্ত হ'ল। বাংলাদেশে, যুক্তপ্রদেশে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বিশেষ অর্ডিনান্স্ জারী করা হ'ল। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও খান আবদুল গফুর খানকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। বাংলাদেশে হিজ্‌লীতে রাজবন্দী-দের ওপর গুলি চল্‌ল। বাঙ্গালি সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর মারা গেল। এই সব অমানুষিক অত্যাচারে জনসাধারণের মনে ক্রোধবহ্নি ধূমায়মান হ'য়ে উঠল। ডিসেম্বরের শেষাশেষি ফিরে এসে গান্ধীজি দেখ্‌লেন দেশের এই অবস্থা। তিনি খেলাচ্ছলে বল্লেন, 'এই অর্ডিনান্স্‌গুলো লর্ড উইলিংডন আমায় নববর্ষের উপহার হিসেবে দিয়েছেন।' সত্যাগ্রহীর রীতি-অনুযায়ী প্রথমটা তিনি গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোষ ক'রতে চাইলেন। উইলিংডনকে চিঠি লিখে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার কথা বল্লেন। ভাইস্‌রয় উত্তর দিলেন, 'শাসনতান্ত্রিক গঠনমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে রাজী আছি। কিন্তু অর্ডিনান্স্ সম্পর্কে বা

সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খান

নেহেরু গফুর খানের গ্রেপ্তার সম্পর্কে কোন রকম আলোচনা করতে আমি প্রস্তুত নই।'

সুতরাং গান্ধীজি ৩১শে ডিসেম্বর থেকে আইন অমান্যের উপদেশ দিতে বাধ্য হলেন। ৪ঠা জানুয়ারি গান্ধীজি ও বল্লভভাই প্যাটেল গ্রেপ্তার হলেন। প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস কমিটি বে-আইনী ঘোষণা করা হ'ল। অসংখ্য জাতীয় শিক্ষাসদন, কিষান-সভা প্রভৃতিরও সেই একই দশা ঘট্‌ল। পুলিশের দমন একভাবেই চল্‌লো। লাঠি-চার্জ্জ, গুলি-চালানো, বিনা বিচারে আটক-করা পর-পর দেখা দিল। হাজার-হাজার লোক আইন ভঙ্গ করল'। বিলিতি কাপড় ও বিলিতি ফার্মের বয়কট তীব্র করা হ'ল। গুজরাট, কর্ণাটক ও বাঙ্গলায় কর দেওয়া বন্ধ হ'ল।

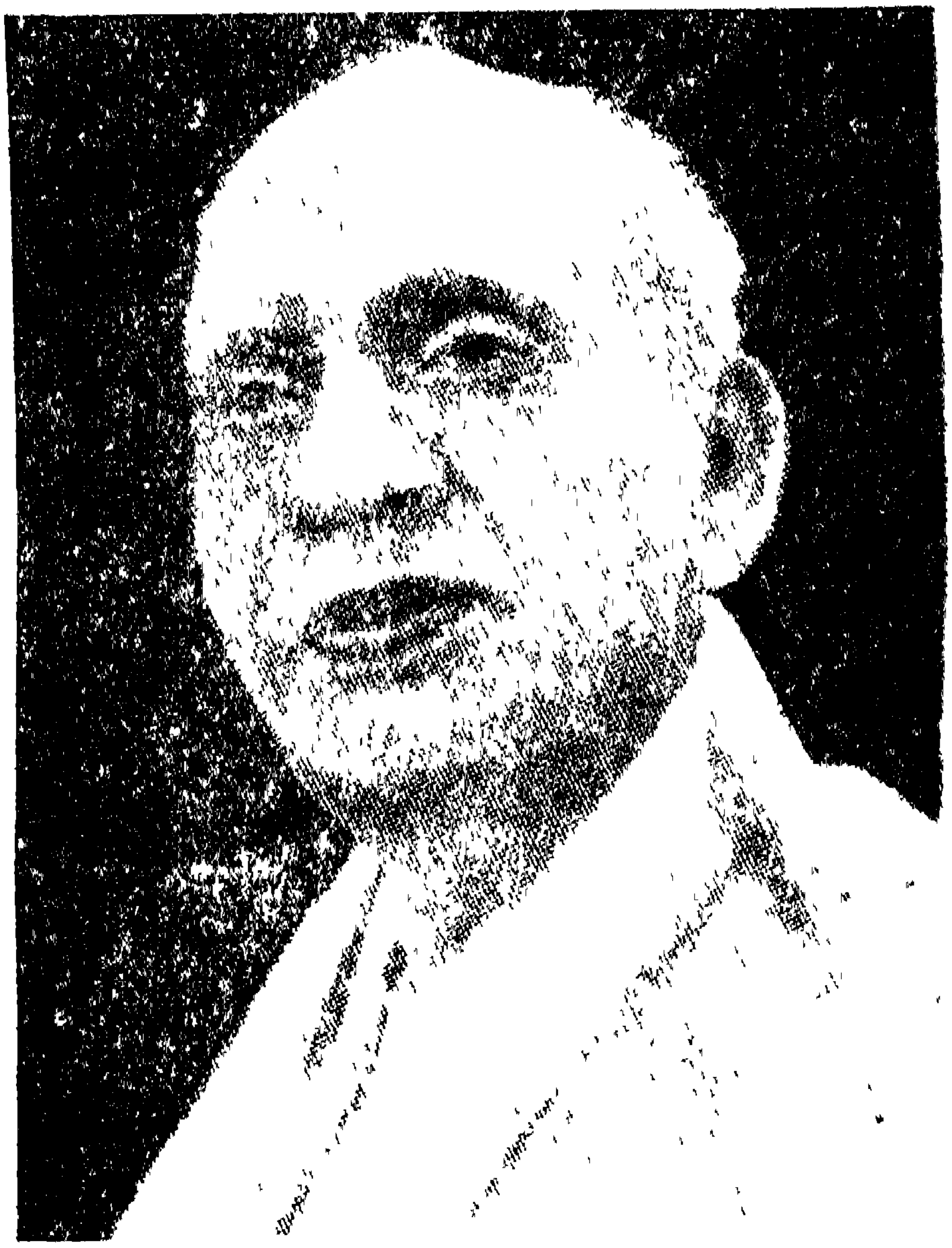

বল্লভভাই প্যাটেল

১৯৩৩ সালে কংগ্রেস সাধারণ আন্দোলন বন্ধ ক'রে

ব্যক্তিগত আইন অমান্যের সূচনা করল'। এক বছর পরে গান্ধীজির উপদেশে আন্দোলন বন্ধ করা হ'ল।

আবার কিছুদিন গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত হ'ল। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করবার সম্মতি জানালো। ইলেকসানে জয়ী হ'য়ে ভারতের বেশীর ভাগ প্রদেশেই কংগ্রেস-মন্ত্রীসভার প্রতিষ্ঠা হ'ল।

কিন্তু সহজ বন্ধুত্বে কাল কাটানো ভারতবর্ষ বা ইংলণ্ড কারুর ভাগ্যেই ছিল না।

ক্রমাগত কুড়ি-বাইশ বছর ধ'রে জোড়া-তালি-দেওয়া শান্তি ভোগ ক'রে হিংসার পূজারী, বস্তুতান্ত্রিক ইউরোপ যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই ইউরোপে আবার রণ-দামামা বেজে উঠ্‌ল। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্ম্মাণী পোলাণ্ড আক্রমণ করল। তার দিনকয়েক পরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করল। ভারতের ভাইসরয় ভাবলেন, কান টানলেই মাথা আসে—ইংলণ্ডের যুদ্ধে যোগ দেওয়া মানেই ভারতবর্ষেরও যুদ্ধে যোগ দেওয়া। সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের মত নিলেন না, প্রাদেশিক কংগ্রেস মন্ত্রীসভার সঙ্গে কোন রকম আলোচনা করলেন না, ভারতের বিভিন্ন দলের নেতাদের সম্মতি গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করলেন না।

ভারতবাসী বিস্মিত হ'ল, ক্রুদ্ধ হ'ল। তাদের গত যুদ্ধের স্মৃতি

সেবাগ্রামে মহাত্মা গান্ধী

একটুও ঝাপ্‌সা হয়নি—তারা আর বোকা বনতে রাজী হ'ল না। কংগ্রেস বল্লে, 'কি রকম হ'ল? ভারতবর্ষ কি ভাইসরয়ের নিজস্ব সম্পত্তি যে, জনসাধারণের অথবা তাদের মনোনীত নেতাদের মতামত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন? ভারতবাসী করবে যুদ্ধ, করবে যুদ্ধে সাহায্য, আর তাদের মতামতের কোন দাম নেই?' জনসাধারণ একযোগে সে কথায় সায় দিল। তারা বল্লে, ইউরোপের যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি, আমাদের কি লাভ?

কংগ্রেস গান্ধীজির উপদেশ প্রার্থনা করল, এখন কি কর্তব্য। গান্ধীজি বল্লেন, 'কাযাকরী ভাবে অসম্মতি জানাবার, ভারতবাসীর আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার একটি মাত্র পথ আছে। তা' হচ্ছে, প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রীসভার পদত্যাগ।'

সেই অনুযায়ী কাজ হ'ল। সব-যায়গায় কংগ্রেস পদত্যাগ-পত্র দাখিল করল।

গান্ধীজি ইংরেজদের বল্লেন, 'আমরা যুদ্ধে যোগ দিতে রাজী নই। কিন্তু তোমাদের যুদ্ধ পরিচালনায় কোন রকম বাধা সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এ-সময় কোন দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু ক'রে তোমাদের বিব্রত করব' না।'

কিন্তু যুদ্ধ-বিদ্বেষী মনোভাব ক্রমশঃ বেড়েই চললো। এদিকে যুদ্ধ বাধার সঙ্গে-সঙ্গেই দেশে ভারত-রক্ষা আইন জারী হ'য়ে গেছ্‌ল। এই আইনের ফলে নাগরিকরা তাদের সমস্ত

অধিকার হারিয়েছিল। যুদ্ধ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে কোন-রকম মতামত প্রকাশ করবার উপায় ছিল না। গান্ধীজি বল্লেন, 'এটা অন্যায়। ইংলণ্ড যদি সত্যি-সত্যি ন্যায়-যুদ্ধ লড়ছে ব'লে ভাবে, তবে ভারতের জনসাধারণের কণ্ঠরোধ করবার তাঁর কোন অধিকার নেই।'

গান্ধীজি ঘোষণা করলেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে প্রচারকার্য্য চালাবার দাবী ক'রে সত্যাগ্রহ সুরু করা হবে। তবে এটা জন আন্দোলন নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। কিন্তু সত্যাগ্রহ সুরু করব কে? বিহারের বিনোবা ভাবে নামে একজনকে গান্ধীজি সত্যাগ্রহ আরম্ভ করবার যোগ্যতম ব্যক্তি ব'লে নির্বাচন করলেন। প্রকাশ্য সভায় বিনোবা যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেন, পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন, বিচারের পর জেলে গেলেন। এইভাবে একে একে প্রায় ৩০০০০ লোক সত্যাগ্রহ ক'রে কারাবরণ করলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্যরাই কারারুদ্ধ হলেন। শুধু গান্ধীজি একা বাইরে রইলেন, গভর্ণমেণ্ট তাঁকে গ্রেপ্তার করল না।

সহসা যুদ্ধের গতি নতুন দিকে বাঁক ঘুরল'। ১৯৪১ সালের ৯ই ডিসেম্বর জাপান ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল। জাপানী বিমান সিঙ্গাপুর আক্রমণ ক'রে ইংরেজদের দুখানি বৃহৎ যুদ্ধ-জাহাজ ডুবিয়ে দিল। জাপানী সৈন্য বর্ম্মা ও মালয় আক্রমণ করল'। যুদ্ধ দ্রুতগতিতে ভারতের দ্বারদেশের কাছে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট্ বুঝল, ব্যাপার সুবিধের নয়। আর ভারতকে অস্বীকার করা চল্‌বে না। এবার ভারতবাসীর সাহায্য না পেলে যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সাময়িকভাবে বৃটেন তার বলদর্পী অহমিকা হজম ক'রে ফেল্‌ল। ভারত-বাসীকে সাধাসাধি করতে হবে। গভর্ণমেণ্ট সমস্ত সত্যাগ্রহীদের ছেড়ে দিল। বিয়াল্লিশ সালের গোড়ার দিকে ভারতবাসীর মানভঞ্জন করবার দূতরূপে স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে ভারতে পাঠান হ'ল।

কিন্তু ছেলে-ভোলানো মোয়া হাতে দিয়ে ভারতবাসীদের ঠাণ্ডা করবার যুগ কেটে গেছে।

ক্রিপস্ ভারতে আসবার পরই গান্ধীজি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ক্রিপ্‌স্ তাঁর লিখিত প্রস্তাব গান্ধীজিকে পড়তে দিলেন। গান্ধীজি প্রস্তাবটা বেশ ভাল ক'রে আদ্যোপান্ত প'ড়ে সহজেই বুঝলেন, আসলে ইংরেজদের ক্ষমতা হস্তান্তর করবার সত্যি-সত্যি কোন মতলব নেই। তিনি দেখে শিখেছেন, ঠেকেও শিখেছেন। ইংরেজদের বাক্-চাতুর্যে আর তিনি ভুল করতে রাজী নন্।

তিনি ক্রিপ্‌স্‌কে বল্লেন, 'এই প্রস্তাব নিয়ে আপনি এতটা পথ মিছামিছিই এসেছেন। আমি শুনেছিলুম আপনার ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্খার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। তা' ছাড়া আপনি জহরলালের বন্ধু। এই প্রস্তাবের দৌত্য-গিরি করতে আপনার লজ্জা হওয়া উচিত ছিল।'

ক্রিপ্‌স্ ক্ষুব্ধস্বরে বল্লেন, 'কেন, কেন? আপনি কি প্রস্তাবটায় কোন কিছুই ভাল দেখছেন না?'

গান্ধীজি বল্লেন, না, দেখছি না। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমরা স্বাধীনতার ছায়া চায়নি, চেয়েছিলুম কায়া। আপনার প্রস্তাবটা যেন post-dated cheque অর্থাৎ আজ্‌কে যে চেক আমাদের দিতে চাইছেন, তা আমরা ভাঙ্গাতে পারব' যুদ্ধ শেষ হ'লে তবে। তখন যে আপনারা এই প্রস্তাবের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করবেন না তার প্রমাণ কি? আমাদের সে অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে। তা' ছাড়া আপনি অর্থাৎ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট্ চান্ আমরা যুদ্ধে যোগ দিই, অথচ যুদ্ধের সময়ে আমাদের হাতে কোন রকম ক্ষমতাই দেবার ব্যবস্থা নেই।'

ক্রিপ্‌স্ ব্যগ্রস্বরে বল্লেন, 'কিন্তু ব্যবস্থা ত আছে। শুধু দেশরক্ষার ব্যাপার ছাড়া শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতাই ত আমরা ভারতীয়দের হাতেই দিতে চাই।'

গান্ধীজি মৃদু হেসে বল্লেন, 'মিঃ ক্রিপ্‌স, আপনি কি আমায় একেবারে ছেলেমানুষ পেয়েছেন? যুদ্ধের সময় গভর্ণমেণ্টের আসল কাজই হ'ল দেশ রক্ষা—একমাত্র কাজও বলতে পারেন। আমি অহিংস হ'লেও এই সোজা কথাটা বেশ বুঝি।'

'দেশরক্ষা সংক্রান্ত কিছু-কিছু কাজ আপনারা করতে পারেন।'

'কি রকম?' গান্ধীজি কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন।

ক্রিপ্‌স্ দু'বার মাথা চুল্‌কে আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে বল্লেন, 'এই যেমন ধরুন, সৈন্যদের জন্যে ক্যান্টিন চালানো, ষ্টেশনারী ছাপানো ইত্যাদি কাজ।'

গান্ধীজি নীরসস্বরে বল্লেন 'ও, আপনি রসিকতা করছেন। প্রস্তাবটা যদি কিছু অদল-বদল করেন ত আমরা ভাল ক'রে ভেবে দেখ্‌তে পারি।'

ক্রিপ্‌স্ রাজী হ'লেন না। বল্লেন, 'প্রস্তাব পছন্দ হয় গ্রহণ করবেন, নয়ত করবেন না। সোজা কথা। কোন অদল-বদলের কথাই উঠ্‌তে পারে না।'

সুতরাং গান্ধীজি প্রস্তাবটা অগ্রাহ্য করলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও তাঁর মতেই সায় দিলেন। ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরও ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব পছন্দসই হ'ল না। ক্রিপ্‌স্-মিশনও সাইমন-কমিশনের দশা প্রাপ্ত হ'ল। ক্রিপ্‌স্ অকৃতকার্য্য হ'য়ে ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন।

ক্রিপ্‌সের আগমনে ভারতের জনসাধারণের মনে অনেক-খানি আশার সঞ্চার হয়েছিল। তারা ভেবেছিল, এতদিনে হয়ত ইংলণ্ডের সুমতি এসেছে। তাই ক্রিপ্‌স্ যখন বিফল হ'য়ে ফিরে গেলেন, তখন লোকের মনে হতাশা ও পরাজয়-মিশ্রিত একটা নিষ্ক্রিয় ভাব দেখা দিল। সেই সঙ্গে ইংরেজ-বিদ্বেষ ভয়ানকভাবে উগ্র হ'য়ে উঠ্‌ল। ইংরেজদের প্রতি ঘৃণায় জনসাধারণ যেন আত্মহারা হ'য়ে গেল। জাপানীরা যত যুদ্ধে জয়লাভ করে, যত ইংরেজরা পিছু হ'টে আসে,

তত দেশের লোক আনন্দে হাততালি দিতে থাকে। ইংরেজদের বীরত্বপূর্ণ পলায়ন নিয়ে করে রসিকতা।

গান্ধীজি দেখলেন, দেশের সামনে সমূহ বিপদ। ঘৃণা এইভাবে বাড়তে থাকলে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ-বিদ্বেষ জাপানী-প্রীতিতে পরিণত হ'তে বাধ্য। তখন যদি জাপানীরা ভারত আক্রমণ করে, ভারতের জনসাধারণের কাছ থেকে তারা কোন-রকম বাধা পাবে না। কিন্তু ভারত কি এতদিন ধ'রে স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্যে এত স্বার্থত্যাগ, এত কষ্ট স্বীকার করল, শুধু মনিব বদল করবার জন্যে? শ্বেতাঙ্গদের তাড়াবে পীতাঙ্গদের বরণ ক'রে নেবার জন্যে?

গান্ধীজির অন্তরাত্মা ব'লে উঠল: না, না, কখনো না। কিন্তু জনসাধারণের মনে যোদ্ধ্ভাব জাগাবার উপায় কি? হঠাৎ এক ঝলক্ বিদ্যুতের মত গান্ধীজির মনে এই সমস্যার সহজ সমাধান খেলে গেল। তিনি ইংরেজদের উদ্দেশ্য ক'রে বল্লেন: Quit India. তোমরা ভারত ছাড়।

ভারত চায় আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করতে। দ্বারদেশ থেকে জাপানীদের ফিরিয়ে দিতে। ভারত আপন-শক্তিতে শত্রু রোধ করবে। সুতরাং যে শ্বেতাঙ্গ বিদেশীগণ, Quit India. ভারত ছাড়।

তোমরা অনেকবার বলেছ, তোমরা মানবের ব্যক্তিগত চিন্তাগত স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্যে যুদ্ধ করছ। তোমাদের কথা শুনে ভারতের দিকে আঙুল দেখিয়ে তোমাদের শত্রুপক্ষ

ব্যঙ্গ-হাসি হাসে। ভারতের চল্লিশ কোটি নবনারীর পায়ে শেকল পরিয়ে রেখে তোমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার ন্যায়-সংগ্রাম করবে কি ক'রে? সে-লজ্জা সে-অপমান থেকে তোমাদের বাঁচাতে চাই। সুতরাং Quit India. ভারত ছাড়।

ডাণ্ডি অভিযানের পূর্ব্বে মহাত্মাজি বড়লাটকে ঐতিহাসিক পত্র লিখিতেছেন

চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের অন্তরের যোগাযোগ আছে। তাদের দুঃখে ভারত দুঃখী, তাদের বিপদে ভারতবাসী উদ্বিগ্ন। কিন্তু পরাধীন ক্রীতদাস ভারত কি ক'রে অন্যদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সাহায্য করবে? ভারত চায় তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে বন্ধুভাবে, সাহায্য করতে স্বাধীনভাবে।

সুতরাং, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট্ Quit India. তোমরা ভারত ছাড়।

১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট বোম্বেতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বস্‌ল। কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করল,

১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট বোম্বেতে মহাত্মাজি ও পণ্ডিত জহরলাল

গান্ধীজির কুইট্‌-ইণ্ডিয়া মন্ত্র মুখে নিয়ে সারা ভারতব্যাপী অহিংস আন্দোলন স্থুরু করা হবে। চিরাচরিত প্রথামত গান্ধীজি স্বয়ং আন্দোলনের নেতৃত্ব করবেন।

গান্ধীজি বল্লেন, আন্দোলন আরম্ভ করবার আগে তিনি ভাইস্‌রয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন। এবার কিন্তু

গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষা করতে রাজী হ'ল না। পাইকারীভাবে গ্রেপ্তার করা সুরু ক'রে দিল। ৯ই আগষ্ট সকালের মধ্যেই গান্ধীজি ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্যরা গ্রেপ্তার হলেন। পুলিশ তাঁদের অনির্দ্দিষ্ট স্থানে অপসারণ করল। শুধু তাই নয়, সেই সময়ের ভেতরই প্রত্যেক প্রদেশে সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের, ছোট হোক্ বড় হোক্, সকলকেই গ্রেপ্তার করা হ'ল। গভর্ণমেণ্ট ভেবেছিল, নেতাদের নির্দ্দেশ না পেয়ে জনসাধারণ শান্ত হ'য়েই থাক্‌বে, পথ খুঁজে পাবে না। কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত।

নিকটের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যেন আগুনের কয়েকটী স্ফুলিঙ্গ ভারতের বুকে এসে পড়ল। প্রলয়—লোলুপ লেলিহান জিহ্বা মেলে বিদ্রোহের আগুন সারা ভারত জুড়ে জ্ব'লে উঠল। খানিকটা যুদ্ধের আবহাওয়ায়, খানিকটা ইংরেজ বিদ্বেষের তীব্রতায়, খানিকটা নেতার অভাবে জনতা একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। কোথায় গেল অহিংসা আর কোথায় গেল শৃঙ্খলা!

পুলিশ ও ইংরেজ-সৈন্যের প্রাচুর্য্যে সহরে অবশ্য ভাল ক'রে বিদ্রোহ জম্‌তে পারলোনা। তবু জনতার সঙ্গে পুলিশ ও সৈন্যের কয়েকদিন ধ'রে রীতিমত সংঘর্ষ চল্‌ল। একদিকে পুলিশ ও সৈন্য, তাদের হাতে রিভলভার রাইফেল ব্রেন্-গান, আর একদিকে জনতা, তাদের অস্ত্র শুধু ইট্-পাটকেল। জনতার মন্ত্র—"করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"। স্বাধীনতার উদ্দীপনায় পুলিশ সৈন্যদের সঙ্গে অসম যুদ্ধ থেকে কেউ পেছিয়ে এলনা। ইংরেজ

টমি দেখলেই লোকে চেঁচিয়ে ওঠে—Quit India. ইট ছুঁড়ে মারবার আগে বলে—বন্দে মাতরম্! ব্রেন্ গানের গুলি খেয়ে প'ড়ে যাবার আগে বলে—মহাত্মাজী কি জয়! সে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনাময় দৃশ্য! কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর প্রভৃতি ভারতের সমস্ত বড় বড় সহরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘট্‌ল। কয়েকদিন ধ'রে সহরগুলো এক-একটা ছোট খাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হ'ল।

কিন্তু গ্রামগুলো প্রায় স্বাধীন হ'য়ে গেল। উন্মত্ত জনতার অগ্রগতির সামনে পুড়ল কত পোষ্টাফিস্, কত রেলষ্টেশন। আদালতের সমস্ত দলিল-পত্র পুড়িয়ে ফেলা হ'ল। থানাগুলো জনতা অধিকার ক'রে নিয়ে তার ওপর ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশ বুদ্ধিমানের মত অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে দিয়ে জনতার কাছে আত্ম-সমর্পণ করল। যেখানে পুলিশ দুঃসাহস দেখিয়ে জনতার ওপর গুলি-বর্ষণ করল, সেখানে পুলিশ-শুদ্ধ থানায় জনতা আগুন লাগিয়ে দিল। টেলিগ্রাফের তার কাটা পড়ল, পোষ্ট উপ্‌ড়ে ফেলা হ'ল। যায়গায়-যায়গায় রেল-লাইন তুলে ফেলা হ'ল। রাস্তার ব্রিজ, কালভার্ট ধ্বংস-প্রাপ্ত হ'ল। এইভাবে মেদিনীপুরের কোন-কোন অঞ্চলে, যুক্ত-প্রদেশের বালিয়া প্রভৃতি স্থানে কয়েক-দিনের জন্যে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেল।

কংগ্রেস তথা গান্ধীজি যা চেয়েছিলেন, তাই হ'ল। কিন্তু অহিংসায় নয়, উন্মত্ত হিংসায়।

হিংসার প্রতিশোধ এলো তার চেয়ে মারাত্মক হিংসায়। কয়েক সপ্তা ধ'রে ব্রিটিশ-সিংহ ও তার ভাড়া-করা মনুষ্যবেশধারী পশুর দল প্রতিহিংসার তাণ্ডবে মেতে উঠলো। সৈন্য সঙ্গে নিয়ে সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী আবার প্রত্যেকটী গ্রামে এসে দেখা দিল। জনতার লাঠি-সড়কির বিরুদ্ধে পুলিশ ও সৈন্যের রাইফেল্ ও মেসিনগান গর্জ্জন ক'রে উঠলো। আকাশ থেকে এরোপ্লেনের মেসিনগান জনতার ওপর মৃত্যু বর্ষণ করতে লাগল। একজন পুলিশ, একজন সরকারী কর্ম্মচারীর বদলে কুড়িজন লোককে হত্যা করা হ'ল, দু'শ জনকে গ্রেপ্তার করা হ'ল, দু'হাজার জনকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করা হ'ল। শুধু হত্যা নয়, তার চেয়েও অকথ্য অমানুষিক অত্যাচার চললো। সরকারের প্রতিহিংসার হাত থেকে নারী ও শিশুরাও নিস্তার পেল না। নির্লজ্জতা ও নৃশংসতা হাত ধরাধরি ক'রে চললো। কখনো-কখনো সৈন্যরা এক-একখানা গ্রাম আগুন লাগিয়ে একেবারে ভস্মীভূত ক'রে ফেল্‌ল। তারপর সেই ধ্বংস-স্তূপের ওপর দিয়ে ট্র্যাক্টর চালিয়ে দিল। পুলিশ ও সৈন্যরা যখন চ'লে গেল, তখন একখানি জীবন-চঞ্চল কলহাস্যময় গ্রামের পরিবর্ত্তে প'ড়ে রইল শ্মশানের মত নির্জ্জন ধূ-ধূ এক সমতল ভূমি।

১৯৪২ সাল রক্তাক্ত অক্ষরে ভারতের বুকে আঁকা হ'য়ে রইল।

আর আগা-খাঁর প্রাসাদে মহামানবের বেদনার্ত্ত আত্মা অসহায় আবেগে মাথা খুঁড়ে মরতে লাগল।

গান্ধীজির অহিংসা

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, মানুষের রাজনীতিক্ষেত্রে মাঝে-মাঝে এক-একজনের আবির্ভাব হয়, যাঁদের মানসিক শক্তি সাধারণের চেয়ে অনেক উঁচুদরের। তাঁদের হাতে থাকে ক্ষমতা প্রয়োগ করবার মত এক-একটা নিষ্ঠুর শক্তিশালী অস্ত্র—তাঁরা তাই দিয়ে মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নেন—সে দুর্ব্বলতা লোভ-ভয়-গর্ব্ব যাই হোক্। কিন্তু গান্ধীজি যখন ভারতের স্বাধীনতার পথ দেখাতে এলেন, তখন তাঁর হাতে জোর করবার মত কোন-রকম অস্ত্র ছিল না। তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে যে প্রভাব ফুটে উঠলো, তা' সৌন্দর্য্যের মত সঙ্গীতের মত অনির্ব্বচনীয়। সেই প্রভাব মানুষ এড়াতে পারল' না, কারণ তা' যেন চুপি চুপি তাদের ডেকে বল্লে, আমি নোব যত দেবো তার চেয়ে অনেক বেশী।'

বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনও গান্ধীজির ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কতকটা এই জাতীয় কথা বলেছিলেন। তিনি বল্লেন, 'দর্পী ইউরোপের শক্তিমত্ত নিষ্ঠুরতার সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যেন গান্ধীজি বল্লেন, আমি মানুষ, আমার সহজ গৌরবের কাছে তুমি মাথা নত কর।'

কিন্তু ব্যক্তিত্ব থাক্‌লেও জনসাধারণকে দলে টানা ত সহজ ব্যাপার নয়। গান্ধীজি তাদের সঙ্গে এক আসনে ব'সে তাদেরই ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির উচ্চ-শিখর থেকে করুণার ভঙ্গীতে উপদেশ

দিতে যাননি। তিনি সহজ সরল ভাষায় দেশবাসীকে ডেকে বলেছিলেন, 'আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি। তোমরা আমার সেই জ্ঞানের অংশ গ্রহণ কর।' জনসাধারণ তাঁকে আপন ব'লে চিনতে পেরেছিল, আত্মীয়ের মত তার ডাকে সাড়া দিয়েছিল।

আমেরিকান সাংবাদিক লুই ফিসারকে গান্ধীজি বলেছিলেন, 'আমি মুখেই খালি সত্যের বন্দনা করিনি, আমার জীবনে প্রত্যেকটী কাজে সত্যের আলোক এসে পড়েছে। তাই আমি সত্যাগ্রহী।'

সত্যাগ্রহ একটা ব্রতের মত। এই ব্রত-পালনের এগারটি নিয়ম গান্ধীজি বেঁধে দিয়েছিলেন।

১। সত্য—সত্যের আরাধনা করবার জন্যেই আমাদের জন্ম। সত্যকে বাদ দিলে আমাদের জীবনের কোন মূল্যই থাকে না, কোন কাজই শুদ্ধভাবে করা যায় না। আর সত্য মানে শুধু সত্যকথা বলা নয়, বিচারে, বাক্যে, আচরণে, চিন্তায় সত্য—সত্য। কিন্তু সত্যকে লাভ করা যায় কি ক'রে? গীতায় ভগবান তার নির্দ্দেশ দিয়েছেন—অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা। সত্যকে প্রাণপণে আঁক্‌ড়ে থাকার নামই অভ্যাস, আর সত্য ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়ে উদাসীনতার নামই বৈরাগ্য।

২। অহিংসা—অহিংসা ছাড়া সত্য-জ্ঞান লাভ করা যায় না। অহিংসা ও সত্য যেন তুষার ও তার শুভ্রতা। পরস্পর এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে, একটাকে বাদ দিলে

আর একটীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। একাগ্রভাবে অহিংসার সাধন করলে তবে সত্য আমাদের সাধ্যায়ত্ত হবে। কিন্তু অহিংসা কি ?

মৃত্যুর মধ্যেই লুকানো থাকে জীবনের বাণী। বীজের মৃত্যু হ'লে তবে শস্যের জন্ম হয়। যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আপনাকে পরিশোধ ক'রে না নিলে উন্নতির আশা করা যায় না। যে যত যন্ত্রণা ভোগ করে এবং সে-যন্ত্রণা যত নির্ম্মল হয়, তারই পরিমাণ দিয়ে অগ্রগতির একটা ধারণা করা যায়। সচেতন যন্ত্রণাভোগের নামই হ'ল অহিংসা।

অহিংসা শুধু মুনি-ঋষিদের জন্যেই নয়—পৃথিবীর সমস্ত জনসাধারণের জন্যই। জীবজগতে পশুর ধর্ম্ম যেমন হিংসা, মানুষের ধর্ম্মও তেমনি অহিংসা। মানুষের মহিমা নিছক দৈহিক ক্ষমতার কাছে অনুগত হ'তে চায় না, সে চায় কোন উচ্চতর নিয়মের—একটা মানস-শক্তির আধিপত্য। অহিংসা সেই নিয়ম, সেই শক্তি।

কিন্তু অহিংসার প্রয়োগ শুধু মানুষে-মানুষে নয়। প্রাণীদের সম্বন্ধেও মানুষের এই মনোভাব পোষণ করা উচিত। বাইবেলে আছে—প্রতিবেশীদের ভালবাসবে। গান্ধীজি সেই সঙ্গে যোগ ক'রে দিয়েছিলেন—এবং সমস্ত পশুপক্ষীই তোমার প্রতিবেশী।

তাই গান্ধীজি গো-রক্ষার সম্বন্ধে ভারতবাসীকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন।

(৩) ব্রহ্মচর্য্য—সমস্ত ইন্দ্রিয় রুদ্ধ ক'রে সব-রকমের ভোগ থেকে বিরত হওয়ার নামই ব্রহ্মচর্য্য। ইন্দ্রিয় বশ না করলে সত্যাগ্রহীর সবচেয়ে বড় শত্রু ক্রোধও দমন করা যাবে না। ক্রোধ জয় না করলে অহিংস হওয়া যায় না, ক্ষমার ভাব মনে আসে না। ভোগে বাধা পড়লেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। যিনি ভোগ ভুলেছেন, তিনি ক্রোধও ভুলেছেন।

গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করা আরম্ভ করেছিলেন।

(৪) অস্বাদ—এ-কথার মানে স্বাদ না নেয়া। সত্যাগ্রহী যা-কিছু আহার করবে, বেঁচে থাকবার প্রয়োজন অনুযায়ী আহার করবে—খেতে ভাল লাগে ব'লে নয়, অন্নের স্বাদ ভাল ব'লে নয়। তাই আমিষ-আহার করা উচিত নয়—আমিষ খাদ্যের সুস্বাদ ব্রতভঙ্গের কারণ হ'তে পারে।

(৫) অস্তেয়—অস্তেয় মানে চুরি না করা। সকলেই জ্ঞানে-অজ্ঞানে অল্প-বিস্তর চুরির অপরাধ ক'রে থাকে। কোন কিছু না ব'লে গ্রহণ করলেই শুধু চুরি করা হয় না, কোন ভাল জিনিষ দেখে পাওয়ার ইচ্ছা মনে জাগাও চুরি। অস্তেয় পালন করার সবচেয়ে সহজ উপায় আপনার আবশ্যক কমিয়ে ফেলা, স্বেচ্ছা-দারিদ্র্য বরণ করা।

(৬) অপরিগ্রহ—পরিগ্রহ করা মানে সঞ্চয় করা। সঞ্চয়ের বোঝা ভারী হ'লে আমাদের সত্যে পৌঁছতে অনেক কষ্ট হয়, অনেক সময় লাগে। তা'ছাড়া পরিগ্রহ করার মানেই হ'ল

ভগবানে বিশ্বাস হারানো। ভবিষ্যৎ ত ভগবানের হাতে—তার জন্যে আমরা সঞ্চয় করতে যাব' কেন? যিনি জীব দিয়েছেন, তিনিই আহার দেবেন। প্রত্যেকদিন আমাদের যা' প্রয়োজন, প্রত্যেকদিন আমরা সেইটুকু খালি সংগ্রহ করব'। ঈশ্বরের নিয়ম তাই। এই নিয়ম না মানার ফলেই পৃথিবীতে এত ধন-বৈষম্য এবং এত কষ্ট।

গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে তাঁর দাদাকে টাকা পাঠাতেন। কিন্তু যেদিন থেকে তিনি অপরিগ্রহ অভ্যাস আরম্ভ করলেন, সেদিন থেকে টাকা পাঠানো বন্ধ হ'ল। এর জন্যে দাদার কাছে তাঁকে অনেক অনুযোগ, অনেক কটূক্তি শুনতে হয়েছিল, তবুও সত্যপথ থেকে কিছুমাত্র বিচলিত হননি।

(৭) অভয়—অভয় না হ'লে সত্যের সন্ধান করা যায় না, তেমনি অহিংসাও পালন করা যায় না। ঈশ্বর-লাভের পথ দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ—সেখানে শুধু বীর যারা তাদেরই যাতায়াত, ভীরুর স্থান নেই। অভয় মানে মৃত্যুভয়, শোকভয়, ইন্দ্রিয়ভয় প্রভৃতি সমস্ত রকম ভয় থেকেই মুক্ত হওয়া। গান্ধীজি বলতেন, কাপুরুষতা ও হিংসার মধ্যে তিনি শেষেরটাকেই বরণ করবেন। হত্যা না ক'রে মরবার সাহস যে অর্জ্জন করতে পারেনি, সে যেন লজ্জাজনকভাবে বিপদের মুখ থেকে পালিয়ে না আসে, মারবার কৌশলটাও যেন আয়ত্ত ক'রে রাখে। অহিংসার আড়ালে কাপুরুষদের আত্ম-গোপন করবার কোন উপায় নেই।

(৮) অস্পৃশ্যতা—জাতিভেদ-প্রথা হিন্দুধর্ম্মের একটী বিশিষ্ট অঙ্গ। ব্রাহ্মণ করতেন জ্ঞান ও ধর্ম্মের চর্চ্চা, ক্ষাত্রিয় করতেন যুদ্ধ ও রাজ্য-শাসন, বৈশ্য করতেন বাণিজ্য এবং শূদ্র করতেন কায়িক শ্রম। এর ভেতর ছোটবড়র কোন প্রশ্নই ছিল না—এ-শুধু সুবিধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী শ্রম-বিভাগ। এই প্রথার ফলেই ভারত একদিন উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু যুগে যুগে ইতিহাসের পরিবর্ত্তনে এই প্রথা অনেক আবর্জ্জনা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে—তার ফলে আজ তার গতি ব্যাহত হয়েছে। অস্পৃশ্যতা হ'ল সব চেয়ে বড় আবর্জ্জনা—তার সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নেই। প্রত্যেক হিন্দুরই এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। অস্পৃশ্য ভাই-বোনদের আদর ক'রে কাছে ডেকে সেবাভাব থেকে তাদের স্পর্শ করা ও স্পর্শ ক'রে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

গান্ধীজি আজীবন অস্পৃশ্যদের উন্নয়ন করবার চেষ্টা ক'রে এসেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি যদি আবার জন্মগ্রহণ করি ত যেন এই অস্পৃশ্যদের মধ্যেই ফিরে আসি, তা'হ'লে আমি আরও ভাল ক'রে তাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অংশ নিতে পারবো।'

(৯) কায়িক শ্রম—পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগ লোক কৃষিকার্য্য ক'রে পৃথিবীর কাজ চালাচ্ছে। তাদের সেই শ্রমের কাছে বাকী দশজনের অলস বুদ্ধি-বিলাসিতার দাম কতটুকু? পৃথিবীর বুদ্ধিমানেরাও যদি কৃষকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে

পরিশ্রম করে ত মানুষের দুঃখের বোঝা অনেক হাল্কা হ'য়ে যায়। আফ্রিকায় টলষ্টয়-ফার্ম্মে নিজে হাতে চাষ ক'রে গান্ধীজি এই সত্যে উপস্থিত হয়েছিলেন।

(১০) সর্ব্বধর্ম্ম-সমভাব—সকল ধর্ম্মেরই মূল এক, সকল ধর্ম্মই ঈশ্বর প্রদত্ত। শুধু দৃষ্টি ও ভাষার হেরফেরে তা' বিভিন্ন-আকার ধারণ করে। ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে কলহ, তা' এই ভাষার কলহ, আসল সত্যের নয়। তা'ছাড়া সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধে সমভাব হ'লে নিজের ধর্ম্মে ভক্তিটা আর অন্ধ থাকে না, তা' জ্ঞানালোকে আরও গভীর আরও নির্ম্মল হ'য়ে ওঠে।

(১১) স্বদেশী—শুধু খদ্দর পরলেই স্বদেশী পালন করা হয় না। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় যা' কিছু স্বদেশে প্রস্তুত হয়, বিদেশী জিনিষের বদলে তা' ব্যবহার করার নামই স্বদেশী। কিন্তু স্বদেশীর আসল উদ্দেশ্য বিদেশী জিনিষের প্রতি ঘৃণা নয়, নিজের দেশের প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি নিঃস্বার্থ-সেবা। সুতরাং স্বদেশীর সঙ্গে অহিংসা বা প্রেমের কোন দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না।

এই সত্যাগ্রহের আদর্শ শুধু গান্ধীজির জীবনের আদর্শ ছিল না, তাঁর অর্থনীতি ও রাজনীতিতেও এই আদর্শই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল।

গান্ধীজির অর্থনীতির ভিত্তি হ'ল যন্ত্রের প্রতি অপরিসীম বিদ্বেষের ওপর। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, 'যন্ত্রের তিরোধানে

আমি বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হব না।' এই বিদ্বেষের যথেষ্ট কারণ আছে।

মানুষ যন্ত্র সৃষ্টি করেছিল কাজের সুবিধের জন্যে। যন্ত্র ছিল তার বন্ধু, শ্রম-লাঘবের একটা সহজ উপায়। কিন্তু বিজ্ঞানের অস্বাভাবিক উন্নতির ফলে সেই যন্ত্র আজ বিগ্‌ড়ে গেছে। ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের দৈত্যের মত সে আজ তার স্রষ্টার আয়ত্তের বাইরে চ'লে গেছে। যন্ত্র এখন আর মানুষের সাথী নয়, সে এখন প্রভু। নিজের হাতে গড়া ফাঁস মানুষের গলায় চেপে বসেছে। যন্ত্র শুধু মানুষের স্বাধীনতা হরণ করেনি, ব্যক্তিত্ব খর্ব করেনি, সেই সঙ্গে সে কেড়ে নিয়েছে তার শ্রমের আনন্দ। শ্রম এখন ভগবানের আশীর্ব্বাদ নয়, যন্ত্রের ক্রীতদাসরূপে দিনগত পাপক্ষয়। এ'ছাড়া আরও বিপদ আছে। যে কাজটা একশ'জন লোক করতে পারত, সে কাজ এখন একজন লোক যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে সম্পন্ন করতে পারে। ফলে, নিরানব্বই জন লোকের করবার উপযোগী কোন কাজ নেই। বছরে-বছরে বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বেকার-সমস্যার আসল কারণ সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটি নয়, যন্ত্রের বাধাহীন আধিপত্য। যন্ত্র মানুষের সভ্যতাকে গ্রাম থেকে নগরে টেনে এনেছে। শহরগুলো ফুলে ফেঁপে উঠ্‌ছে আর গ্রামগুলো যাচ্ছে শুকিয়ে। গ্রাম থেকে খাদ্য-অর্থ সমস্ত কিছু সহর শোষণ ক'রে নিচ্ছে। এক একটা দুর্ভিক্ষ আস্‌ছে, আর হাজার হাজার গ্রামবাসী নীরবে

মরছে, সহরে তার আঁচ সামান্য একটু লাগ্‌ছে। অথচ ভাগ্যের এমনি পরিহাস খাদ্য-সম্ভার প্রস্তুত হয় সহরে নয়, গ্রামে। কিন্তু গ্রামের কঙ্কালের ওপর ভিৎ ক'রে যে সহর গ'ড়ে তোলা হয়েছে, তার আলোকজ্জ্বল সভ্যতার ইমারতে নানা অশান্তি-ভূতের উৎপাত হ'তে বাধ্য। মাটীর আকর্ষণ ছেড়ে খাদ্যের সন্ধানে কৃষকেরা সহরে চ'লে আসছে। সেখানে যন্ত্রের তাঁবেদারি ক'রে তারা হ'য়ে উঠছে শ্রমিক। সামান্য একটু উত্তেজনাতেই তারা হিংসায় অন্ধ হ'য়ে ওঠে। সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। যাদের অতীত নেই, ভবিষ্যৎ অন্ধকার, বর্ত্তমানের আবেগে তারাই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এই শ্রমিক-মালিকদের সংঘর্ষ উত্তরোত্তর উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করছে। একটা প্রচণ্ড হিংসার কালো মেঘ ক্রমশঃ শতাব্দীর আকাশ ছেয়ে আসছে। এ যেন সহরের ওপর গ্রামের অদৃশ্য প্রতিশোধ।

এই দুর্দ্দশা এড়াতে হ'লে আমাদের যন্ত্রকে বাতিল করতে হবে। আবার গ্রামে ফিরে যেতে হবে। সহরের অস্বাস্থ্যকর আপাত-উন্নতি দূর ক'রে গ্রাম-গুলোকে আত্ম-সম্পূর্ণ ক'রে তুল্‌তে হবে। তার প্রথম উপায় হবে, ঘরে-ঘরে চরকার প্রতিষ্ঠা করা। চরকাও অবশ্য যন্ত্র। কিন্তু চরকা সেই যুগের, যখন যন্ত্র ছিল মানুষের সখা। চাষীরা বছরের ভেতর চারমাস প্রায় অলস হ'য়ে ঘরে ব'সে থাকে। সেই সময়ে যদি তারা নিয়মিত চরকা কাটে ত সারাবছর কখনো তাদের

বস্ত্রের অভাব হবে না। শুধু তাই নয়, সহরে সেই বস্ত্র চালান দিয়ে তারা প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষ কিন্‌তে পাববে। তাদের অসহ্য দারিদ্র্য আর তখন অসহ্য হবে না। আব শুধু চরকা নয়, অন্যান্য কুটীর-শিল্পগুলিকেও আবাব জাগিয়ে তুলতে হবে। ধান ভানা, গম পেষা, সাবান তৈবী, কাগজ তৈবী, তেল কবা, চামড়া পাকা করা প্রভৃতি অবশ্য-প্রয়োজনীয় শিল্পগুলি না থাক্‌লে গ্রাম্যজীবন সম্পূর্ণ হবে না।

এই ধরণেব জীবন-যাত্রায় আমাদেব অনেক বিলাসিতা ত্যাগ কবতে হবে, অনেক কৃত্রিম অভাব অনুভব করব। কিন্তু সেই অভাব শেষ পর্যান্ত দেখা দেবে বিধাতার আশীর্ব্বাদ-রূপে। আমবা বিংশ শতাব্দীকে হারাবো, তার বদলে ফিবে পাব চিবশান্তি।

গান্ধীজিব বাজনীতিতেও ঠিক এই বকম সারল্য ও সত্যেব প্রভাব দেখা যায়। তিনি আসলে ছিলেন ধার্ম্মিক, অবস্থাব ফেরে হয়েছিলেন বাজনীতিবিদ। একবাব ববীন্দ্রনাথের অনুযোগের উত্তবে বলেছিলেন, 'আজ যদি আমি বাজনীতিতে অংশ গ্রহণ কবেছি ব'লে মনে হয়, তার একমাত্র কাবণ রাজনীতি আমাদের নাগপাশের মত জড়িয়ে বযেছে। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, এর হাত থেকে নিস্তার নেই। আমি সাপের সঙ্গে যুঝ্‌তে চাই।...আমি বাজনীতির মধ্যে ধর্ম্মকে ঢোকাবার চেষ্টা করছি।'

এই চেষ্টার ফলে তিনি পৃথিবীর অন্যান্য রাজনীতিকদের

উপহাসের পাত্র হ'য়ে উঠেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সহজে শান্তভাবে স্বীকার করতেন, 'আমি ভুল করিছি।' তা'ছাড়া তাঁর আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি লেখার ভেতর দিয়ে ভাবতেন। আজ যে চিন্তা তাঁর মনে এল, তিনি তা 'হরিজনে' ছাপ্‌লেন। আবার ভাবতে-ভাব্‌তে তিনি প্রথমদিনের চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন। দ্বিতীয় দিনে 'হরিজনে' তা' প্রকাশিত হ'ল। ফল, তাঁর শত্রুরা তাঁর প্রথমদিনের চিন্তা দিয়ে দ্বিতীয় দিনের চিন্তাকে ব্যঙ্গ করত। কিন্তু গান্ধীজি তা'তে একটুও লজ্জিত হতেন না। কারণ রাজনীতি ত আর তাঁর কাছে কূটনীতি নয়, সত্যের পূজা। যখনই জনতা উত্তেজনার বশে এই পূজার রীতি ভঙ্গ করেছে তখনই সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আন্দোলন বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। রাজনীতিকের পক্ষে এটা হয়ত অমার্জ্জনীয় অপরাধ, কিন্তু তাঁর কাছে স্বাধীনতার চেয়ে সত্য বড় ছিল।

এই সত্যনিষ্ঠার ফলেই জাতীয় নেতা হ'য়েও জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে তিনি বন্দী ছিলেন না। তিনি বল্‌তেন, 'আমার কাছে দেশপ্রীতি হ'ল মানবপ্রীতির সমান। আমি মানুষকে ভালবাসি, তাই দেশকেও ভালবাসি। অন্য দেশকে বাদ দিয়ে আমার দেশপ্রীতি নয়; ভারতের মঙ্গলের জন্যে আমি ইংলণ্ড অথবা জার্ম্মানীকে আঘাত করতে পারব'না। মানব-প্রীতিতে যদি উত্তাপ না থাকে ত দেশপ্রেমের উত্তাপও অনেকখানি ক'মে যায়।'

এইভাবে গান্ধীজির প্রতিটী চিন্তার আরম্ভ অহিংসায়, শেষ অহিংসায়।

হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য-প্রচেষ্টা

গান্ধীজি বলতেন, 'আমার যৌবনের প্রারম্ভে যখন আমি রাজনীতির কিছুই জানতুম না, তখন থেকেই আমি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে আন্তরিক মিলনের স্বপ্ন দেখ্‌তুম।' এই স্বপ্ন সফল করবার চেষ্টাতেই গান্ধীজি তাঁর জীবনের শেষদুটী বছর সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে গেছেন। আর এই চেষ্টাই শেষ পর্য্যন্ত তাঁর ক্রুশে পরিণত হয়েছিল'।

ভারতের অনেক ধর্ম্ম, অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানই সংখ্যা-গরিষ্ঠ। দু'টী পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মমত পাশাপাশি একদেশে থাক্‌লে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধ্‌তে বাধ্য। গোরু হিন্দুদের দেবী-জাতীয়, অথচ মুসলমানেরা তাদের সামনে গো-হত্যা করবে। মস্‌জিদে নীরবতা পালন করা বিধান, অথচ হিন্দুরা তার সামনে দিয়ে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে যাবে। প্রথমে প্রতিবাদ, তারপর বচসা, তারপর দাঙ্গা। এইভাবে চ'লে আস্‌ছে।

এই দাঙ্গার আর একটা কারণ আছে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় মুসলমান বাদশা বাহাদুর শা'কে ভারতের সম্রাট্ ব'লে ঘোষণা করা হয়েছিল। তাই বিদ্রোহ দমন করার জন্যে মুসলমানরাই ইংরেজদের ওপর সবচেয়ে বেশী ক্ষেপে ওঠে।

তারা ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে অসহযোগ সুরু করে। ফলে হিন্দুরা যত শিক্ষা, সভ্যতা ও অর্থে উত্তরোত্তর উন্নতির চরমে এগিয়ে যেতে থাকে, মুসলমানরা তত অশিক্ষা ও দারিদ্র্যময় অজ্ঞানতার তিমিরে ডুবতে থাকে। হিন্দুদের অন্তর ও বাইরের ঐশ্বর্য্যে স্বভাবতই তাদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হয়। ধর্ম্ম-বিদ্বেষের সঙ্গে এই ঈর্ষা মিশে দাঙ্গার খোরাক যোগায়।

খিলাফৎ আন্দোলনের সময় গান্ধীজির চেষ্টায় প্রথম হিন্দু মুসলমানে মিলন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সে মিলন বেশীদিন থাকেনি—থাক্‌তে পারে না। কারণ মুসলমানদের চোখে খিলাফতের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্ম, জাতীয়তা ছিল গৌণ। আন্দোলন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তার ভাবও উবে যায়। গান্ধীজি অবশ্য কংগ্রেসকে গঠনমূলক কাজের যে নীতিগুলি দিয়েছিলেন, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সৃষ্টি করা ও বজায় রাখাও তার একটি। কংগ্রেস তবুও এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করেনি—বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া। কংগ্রেস ভেবেছিল, হিন্দুদের মত মুসলমানেরাও বুঝি আপনা থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌বে। কংগ্রেস ভুলে গেছ্‌ল, মুসলমানদের অশিক্ষা ও ধর্ম্মের গোঁড়ামী অনেক বেশী। কংগ্রেস ভুলে গেছল, অন্যান্য ভাবের মত জাতীয়তার ভাবও শিক্ষা দিতে হয়—কেউ আপনা থেকে শেখে না।

ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ও মুসলমানদের প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা

কংগ্রেসের এই অমনোযোগিতার সুযোগ নিতে ছাড়ে নি। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট্ কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড প্রভৃতি কুটিল রাজনৈতিক প্যাঁচে মুসলমানদের বুঝিয়ে দিল, তোমরা আমাদের আসল সন্তান আর হিন্দুরা হ'ল সৎছেলে। মুসলমান নেতারাও বোঝালো, হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দিলে আমাদের লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী, তার চেয়ে আমরা যদি রাজভক্তি অক্ষুণ্ণ রেখে হিন্দুদের বিরোধিতা করি ত ইংরেজদের প্রসাদ পাওয়া সহজ হবে। এইভাবে ইংরেজদের বিভেদ-নীতির আওতায় হিন্দু-মুসলমানদের যে বিদ্বেষ শুধ্ ধর্ম্মপ্রসূত ছিল, তা' রাজনীতিতেও মিশে যায়। ভারতীয় মুসলমানদের দল মুস্লিম্ লিগের ক্ষমতা বাড়তে থাকে, আর দু'টী সম্প্রদায় পরস্পর থেকে অনেক দূরে চ'লে যায়।

১৯৪০ সালে মুস্লিম্ লিগ্ দাবী করলো, ভারতকে দু'ভাগে ভাগ করা হোক—এক ভাগ হবে হিন্দুদের রাজত্ব হিন্দুস্থান, আর এক ভাগ হবে মুসলমানদের রাজত্ব পাকিস্থান। পূর্ব্বে আসাম ও বাংলা, পশ্চিমে সিন্ধু, বেলুচিস্থান, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পাকিস্থান রাজ্য গড়া হবে। মুসলমান-নেতা জিন্না কারণ দেখালেন, অখণ্ড ভারতে হিন্দুরা মুসলমানদের উন্নতির পথে বাধা দেবে, নানারকমের অত্যাচার করবে। পাকিস্থান-দাবীর আসল কারণ অন্য। একেত বর্ত্তমান জগতে ইস্লাম সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্ম্ম। তার ওপর মুসলমান নেতাদের ভয় ছিল,

অখণ্ড ভারতে হিন্দুনেতাদের সঙ্গে যোগ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁরা পেরে উঠ্‌বেন না। গান্ধীজি মুসলমান-নেতাদের ডেকে বল্লেন, 'পাকিস্থান-দাবীতে যদি কিছু সত্য থাকে ত কংগ্রেস অবশ্যই তা' মেনে নেবে। ইংরেজদের কাছে প্রার্থনা না ক'বে আপনারা আসুন আমাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।' কিন্তু মুসলমান নেতারা বাজী হলেন না। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, কংগ্রেস আন্দোলন ক'বে ভাবতের স্বাধীনতা আনুক; তখন তাঁরা ইংবেজদেব কাছে অনুবোধ করবেন, প্রভু, তোমরা যাবাব আগে আমাদের পাকিস্থান দিয়ে যাও।

১৯৪৫ সালে ইতিহাসের অনেক পরিবর্ত্তন দেখা গেল। মিত্রশক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করলো। বিলেতে লেবার পার্টি ইলেক্‌সনে জয়ী হ'য়ে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলো। ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্যে ভারতে একটি মন্ত্রী-মিশন পাঠানো হ'ল। তার আগেই পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে মে মাসে গান্ধীজি প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা কংগ্রেসের বিশেষ মনঃপূত হ'ল না। কারণ এতে শুধু পাকিস্থানের ইঙ্গিত ছিল না, দেশীয় রাজ্যগুলিরও আলাদা হবাব সম্ভাবনা ছিল। নানা আপত্তি সত্ত্বেও গান্ধীজির উপদেশে কংগ্রেস এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। কিন্তু মুস্‌লিম লিগ্‌ খানিকটা নিল, খানিকটা নিল না। ভারতের রাজনৈতিক আকাশ আবার অস্বস্তিতে ভ'রে উঠ্‌লো।

মুসলমান নেতারা দেখলেন, এই সুযোগ। হিন্দু-নেতাদের উদারতা ও শান্তিপ্রিয়তার সুযোগ নেবার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। মিঃ জিন্না ঘোষণা করলেন, পাকিস্থান লাভ করবার জন্যে মুসলমানরা এইবার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু করবে।

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট ভারতের মহাকলঙ্কের দিন। ঐ দিন কলিকাতায় প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম দিবস অনুষ্ঠিত হ'ল। ময়দানের সভায় মুসলমান নেতারা জ্বালাময়ী ভাষায় জনতাকে আদেশ দিলেন, হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবার সময় এসেছে। ক্ষিপ্ত জনতা হিন্দুদের দোকান লুট করলো, বাড়ীঘর লুট করলো, তারপর আগুন লাগিয়ে দিল। প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও হিন্দুরা পরে ঘুরে দাঁড়ালো। দুই সম্প্রদায়ে প্রচণ্ড দাঙ্গা বেধে গেল। চারদিন ধ'রে কলিকাতা সহর নারকীয় ও ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। সহরের আকাশ আগুনে রাঙা হ'য়ে উঠলো, তার নীচে উন্মত্ত চীৎকার শোনা গেল, 'আল্লা হো আকবর' 'জয় হিন্দ' 'কালী-মাইকি-জয়'—আর সহরের পথে ঘাটে শিশু-নর-নারীর অজস্র মৃতদেহ শকুনির ক্ষুধা মেটাতে লাগলো।

সারা ভারত শিউরে উঠলো। গান্ধীজি চমকে উঠে ভাবলেন, কলিকাতাবাসীর মনে কি শয়তানের আবির্ভাব হয়েছে? তা' নইলে ভাইয়ে-ভাইয়ে এত নৃশংসতা, এত হিংসা!

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জের কিন্তু কলিকাতাতেই শেষ হ'ল না।

পূর্ব্ববঙ্গের নোয়াখালি ও ত্রিপুরার হিন্দুরা সংখ্যায় শতকরা মাত্র কুড়িজন। মুসলমানরা এইবার সেখানে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করলো, কারণ এখানে মার দিয়ে উল্টে মার খাবার সম্ভাবনা নেই। হিন্দুদের ঘরবাড়ী লুট হ'ল। মুসলমান জনতা হিন্দুদের গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিল। কত হিন্দু প্রাণভয়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করলো, কত হিন্দুনারীকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হ'ল। যারা বাধা দিতে গেল তারা প্রাণ হারালো।

গান্ধীজি এবার আর স্থির থাকতে পারলেন না। নোয়াখালির ঘটনা ত দাঙ্গা নয়, নিছক অত্যাচার। নোয়াখালি থেকে লাঞ্ছিত মানবতার মর্ম্মন্তুদ্ ক্রন্দন ভেসে এসে গান্ধীজিকে আকুল ক'রে তুলল। সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধ ছুটে চললেন আর্ত্ত-জন্গণের ডাকে—তাদের বেদনা নীলকণ্ঠের মত নিজে ধারণ করতে। আর মুসলমানদের কাছে গেলেন শান্তির দূত-রূপে—মৈত্রী-করুণার প্রদীপ হাতে নিয়ে।

৭ই নভেম্বর তিনি চৌমুহনীতে পৌঁছলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁহার হিন্দি কথাবার্ত্তা এবং বক্তৃতা বাঙ্গালা করে সাধারণ লোককে বুঝাবার জন্যে প্রফেসর নির্ম্মল বসু মহাশয়। লক্ষ্মীপুর থানার দত্তপাড়া গ্রামে তাঁর শিবির প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে নোয়াখালির গ্রাম-পরিক্রমণ সুরু করলেন। দেখলেন গ্রামে-গ্রামে ধ্বংস-লীলা। কোথাও ধর্ম্মান্তরিত

হিন্দুর গলায় কণ্ঠি পরিয়ে দিলেন, কোথাও বা নির্য্যাতিতা নারীর হাতে পরিয়ে দিলেন শাঁখা। মুসলমানদেরও তিনি হেলা করলেন না। দরিদ্র মুসলমান চাষীর গৃহ প্রাঙ্গনে ব'সে:

প্রফেসর নির্ম্মল বসু ও শ্রীযুত শঙ্করারাও দেও রামগঞ্জ থানার মানচিত্র লইয়া মহাত্মাজীর গ্রামান্তর ভ্রমণ সম্পর্কীয় বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন।

তাদের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের রোগ-জীর্ণ সন্তানদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। মুসলমান গ্রামবাসীরা তাঁকে ফল-মূল উপহার দিল, তিনি সানন্দে তা' গ্রহণ করলেন।

গ্রাম-পরিভ্রমণ করতে করতে গান্ধীজি বল্লেন, 'যতই আমি এই অঞ্চলে প্রবেশ করছি, ততই বুঝছি ভয়ই মানুষের শ্রেষ্ঠ শত্রু। যারা ভয় দেখিয়েছে, আবার যারা ভয় পেয়েছে, ভয় উভয়েরই জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে। যারা ভয় দেখাচ্ছে তারাও কিছু-না কিছু বিষয়ে উৎপীড়িতদের ভয় করে।

গান্ধীজী সুপারী গাছের তৈরী একটি সেতু অতিক্রম করিতেছেন।

লোকের মনে সাহস ফিরিয়ে আনবার জন্যে তাদের এই ভয় ভাঙ্‌বার জন্যে গান্ধীজি ঠিক করলেন, একটী মুসলমান প্রধান গ্রামে তিনি একা গিয়ে থাকবেন। তাঁর দৃষ্টান্ত হয়ত হিন্দুদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীরামপুর গ্রামে বাস সুরু করলেন। কিন্তু বেশীদিন এই পরীক্ষা চল্‌লো না।

ইতিমধ্যে বিহারে নোয়াখালির প্রতিশোধ নেওয়া আরম্ভ হ'য়ে গেছল। নোয়াখালিতে হিন্দুদের যা' দশা হয়েছিল, বিহারে মুসলমানদের দশা তার চেয়েও কম হ'ল না গান্ধীজি বল্লেন, 'আমার বিশ্বাস বিহারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'লে তবে নোয়াখালিতে শান্তি বজায় থাক্‌বে।

১৯৪৭ সালের ১২ই মার্চ্চ গান্ধীজি বিহার-পরিভ্রমণে গেলেন। বিহারের হিন্দুদের স্নিগ্ধ তিরস্কারের সুরে বল্লেন, হিংসা দিয়ে কখনো হিংসার শোধ নেওয়া যায় না। তা' ছাড়া দোষ করলো নোয়াখালির মুসলমানরা, আর তার জন্যে শাস্তি ভোগ করবে বিহারের মুসলমানরা ? এ কোন ধরণের যুক্তি। এই দাঙ্গা যে পৃথিবীর কাছে ভারতবাসীর মাথা হেঁট ক'রে দিচ্ছে। ইংরেজরা ত এখন অনায়াসে বলতে পারে তোমরা যদি নিজেদের ভেতর এই রকম কামড়া-কামড়ি কর' ত তোমাদের স্বাধীনতা দিই কি ক'রে ?' এখানেও তাঁর পরিভ্রমণ বিফল হ'ল না। বিহারে শান্তি ফিরে এল।

কিন্তু গান্ধীজির আর বিশ্রাম করা ভাগ্যে ছিল না। তাঁর জীবনের বাকী কটা দিন হিন্দু-মুসলমান হিংসার আবর্ত্তে ঘুরপাক খেতে লাগ্‌ল আর অশীতিপর মহাত্মা তাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

ভারতের বড়লাট বদল হ'ল। নতুন বড় লাট মাউণ্ট্‌-ব্যাটেনের চেষ্টায় মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা একেবারে ব্যর্থ হ'ল না। দাঙ্গা বন্ধ করবার জন্যে শেষপর্য্যন্ত কংগ্রেস

পাকিস্থান মেনে নিল। অবশ্য মুস্‌লিম্ লিগের দাবী পুরোপুরী মিট্‌ল না। তারা আসাম পেল না—বাংলাও পাঞ্জাবও দু'ভাগ করা হ'ল। মুসলমান প্রধান স্থানগুলি শুধু মুসলিম লিগ পেল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ও পাকিস্থান স্বায়ত্তশাসন লাভ ক'রে ডোমিনিয়নে পরিণত হ'ল। কিন্তু কংগ্রেসের আশা পূর্ণ হ'ল না।

মহাত্মাজি আমেরিকান মহিলা সাংবাদিকের সহিত কথোপকথন রত।

স্বায়ত্তসাশন লাভ করবার দিন দশ বারো পরেই কলিকাতায় আবার হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বেধে গেল। গান্ধীজি দিল্লী থেকে ছুটে এলেন। দাঙ্গা বন্ধ করবার কোন উপায় নেই দেখে তিনি ১লা সেপ্টেম্বর থেকে অনশন আরম্ভ করলেন। সহরে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হ'লে তবে অনশন ত্যাগ

করবেন মহাত্মার এই অনশনের অতি দ্রুত ও বিস্ময়কর ফল দেখা গেল। সহরের পথে-পথে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শোভাযাত্রা বেরোল। দাঙ্গা করবার জন্যে সংগৃহীত অস্ত্র-শস্ত্র অনেকে গান্ধীজির কাছে সমর্পণ করল'। পুরো একদিন সহরে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল না।

কিন্তু হিংসার জীবাণু তখন আকাশে বাতাসে। কলিকাতা শান্ত হ'ল ত দিল্লী ক্ষেপে গেল। দিল্লীর ক্ষেপবার অবশ্য কারণ আছে। ১৫ই আগষ্ট থেকেই পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলমানের ভয়াবহ সংঘর্ষ বেধেছিল। শেষে অবস্থা এমন হ'ল যে পূর্ব্ব পাঞ্জাব থেকে সমস্ত মুসলমানরা আর পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে সমস্ত হিন্দু ও শিখরা পালাতে বাধ্য হ'ল। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আশ্রয়-প্রার্থীরা দিল্লীতে এসে হাজির হ'ল। দিল্লীর লোকেরা তাদের মুখ থেকে শুনল ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কাহিনী। তারা ক্ষিপ্ত হ'য়ে দিল্লীতে মুসলমানদের আক্রমণ সুরু করল'।

গান্ধীজি দিল্লীতে এসে প্রথমে হিন্দুদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন। তিনি বারবার বল্লেন, সত্যিকারের প্রতিশোধ নেওয়া যায় প্রেম ও করুণা দিয়ে। ভারতে হিন্দুরা যদি মুসলমানদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে ত পাকিস্থানের মুসলমানরা লজ্জায় আপনা থেকেই হিন্দু পীড়ন বন্ধ করবে।' কিন্তু উত্তেজিত জীঘাংসা প্রণোদিত জনতার যুক্তি শোনবার সময় কোথায়? সুতরাং গান্ধীজি ১৯৪৮ সালে ১৩ই জানুয়ারী

সকাল এগারোটা থেকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে অনশন আরম্ভ করলেন—উদ্দেশ্য, দাঙ্গাকারীদের অন্তরের পরিবর্ত্তন আনয়ন করা।

গান্ধীজি বল্লেন, হিন্দু-মুসলমানে মিলন সম্পূর্ণ হ'লে তবেই আমরা প্রকৃত স্বরাজ লাভ করতে পারিব। তখনও হয়ত আইনের দৃষ্টিতে ও ভৌগলিক দৃষ্টিতে দু'টী ভিন্ন রাষ্ট্র থাক্‌বে, কিন্তু প্রতিদিনের কাজে কেউ ভাবতেও পারবে না যে তারা ভিন্ন রাষ্ট্রের লোক। এই স্বপ্ন সফল করতে কে না আত্ম-জীবন বিপন্ন করবে? মরতে যখ একদিন হইবেই আর মৃত্যুকে ভয় হবে কেন?'

তিনি যেন তাঁর ভবিষ্যৎ মানস-চক্ষে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। বুঝেছিলেন মৃত্যুদূত তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য অনশনে তাঁকে মরতে হয়নি, কারণ দিল্লীর অধিবাসীরা একবদ্ধ হ'য়ে শান্তি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এই অনশনই তাঁর জীবনের শেষ পরিচ্ছেদের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর স্বার্থত্যাগ প্রতিক্রিয়াশীল লোকেদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের শুধু খোরাক যোগাচ্ছিল। তারা ষড়যন্ত্র করল, ভারতের আত্মাকে ক্রুশবিদ্ধ করতে হবে, গান্ধীজির উদারতার উৎস বন্ধ করতে হবে।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি শুক্রবার গান্ধীজি নিয়মত বেলা পাচটার সময় প্রার্থনা সভায় যাত্রা করলেন। প্রার্থনা সভায় প্রবেশ করবার মুখে একটি লোক পদধূলি নেবার ভঙ্গীতে তাঁর

পায়েব কাছে লুটিয়ে পড়ল।' তিনি তাকে তুল্‌তে গেলেন, এমন সময় সে পকেট থেকে পিস্তল বাব ক'বে পরপর তিনবার গান্ধীজিকে গুলি করলে। পেটে ও বুকে গুলি বিদ্ধ হ'ল। গান্ধীজি হা-রাম ব'লে লুটিয়ে পড়লেন। দিল্লীব মাটী, ভারতের ইতিহাস রক্তে রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ল।'

শতাব্দীর সূর্য্য রক্তমেঘ মাঝে অস্ত গেল।

উপসংহার

ভগবান, তুমি যুগে-যুগে মানুষের পৃথিবীতে তোমার দূত পাঠিয়াছ'।

তাঁদের মাটির দেহ দেখ মানুষ তাঁদের চিনতে পারেনি। সেই বরনীয় ও স্মরণীয়দের তারা ব্যর্থ নমস্কারে দ্বার থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে। মূঢ় মানুষ, উদ্ধত মানুষ তাতেও সন্তুষ্ট হয়নি। তোমার দূতের গায়ে তারা অনাদরের ধূলা ছুঁড়ে দিযেছে।

সেই ধূলা মহামানবদের গায়ে লাগেনি। তোমার অমোঘ বিধান সেই ধূলা ফিরে এসে মানুষের চোখ অন্ধ ক'রে দিয়েছে। তারপর পৃথিবীতে নেমে এসেছে চির-রাত্রির অন্ধকার। সেই ভয়ঙ্করী তমিস্রার মাঝে শুধু নিরবচ্ছিন্নভাবে শোনা যাচ্ছে হিংস্র চীৎকার। ক্ষুধার্ত্ত রক্ত-লোলুপ নেকড়ে বাঘের দল যেন মহাশ্মশানে শবদেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি হানাহানি করছে।

এই নেকড়ে বাঘ পৃথিবীর অর্থগৃধ ক্ষমতালোভীর দল আর শবদেহ পিষ্পীড়িত জনগন।

"ভগবান, তুমি আলোর প্রার্থনা শুনতে পাচ্ছ'না?

মন্দিরে শঙ্খ বাতাসে কেঁপে-কেঁপে বাজ্‌ছে।

মস্‌জিদে আজানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

গীর্জ্জার ঘণ্টা বৃথাই ভক্তদের আহ্বান করছে।"

কিন্তু তার মধ্যে শান্তির ইঙ্গিত কোথায়? কোথায় আশা, কোথায় আশ্রয়, কোথায় মহান্ আলোক? দেবালয়ের পূজারীরা নীরস প্রাণহীন ধর্ম্মের উপদেশ দিয়েই খালাস্।

তারা মানুষকে বল্গাহীন শক্তিদর্পের সামনে মাথাতুলে দাঁড়াবার পথ ব'লে দেয় না। দুর্ব্বল শান্তিবাদীরা অসহায় ক্রন্দন দিয়ে যেন শান্তিকে ব্যঙ্গ করে। আর ক্ষমতা-অন্ধ জাতির দল হিংসা দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রতিষ্ঠা করে লিগ্ অফ্ নেশনস্, ইউ. এন. ও। কিন্তু রক্তাক্ত হাতের পূজা ত শান্তির দেবতা গ্রহণ করেন না। তাই শান্তি হয় সুদূর পরাহত।

এই পৃথিবীতে সত্যাগ্রহের বাণী নিয়ে এসেছিলেন গান্ধীজি। তিনি শুধু বাণী দেননি, দিয়েছিলেন দৃষ্টান্ত। তিনি বলেছিলেন, আমার জীবনই আমার বাণী।

মানুষ সে বাণী শুনেও শুন্ল না। মানুষের পাপের বোঝা কি এখনো হাল্কা হয়নি? মানুষের ভাগ্য যেন নাথুরাম গড্সের মূর্ত্তিতে রূপায়িত হ'য়ে উঠ্লো। আত্মহারা মানুষ আত্মঘাতী হ'ল।

যীশুখৃষ্ট বলেছিলেন, 'Weep not for me, ye daughters of Jerusalem, weep for thy self and thy sons. গান্ধীজিও যেন আমাদের অন্তরে-অন্তরে সেই কথা ব'লে চলেছেন।

না, আমাদের চোখে জল নেই। আমাদের প্রাপ্য শাস্তি আমরা মাথা পেতে নিইছি। আমরা শুধু করযোড়ে তর্পণের মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে বল্ছিঃ এহি, বাপুজী, পুণরেহি।

আমরা বল্ছি, 'হে পিতৃলোকগত জ্যোতির্ম্ময় সত্তা, দিব্য উজ্জ্বলরূপে তুমি আবির্ভূত হও, তোমার সন্তানগণের মধ্যে

তুমি নবজন্ম লাভ কর। তোমাকে বক্ষে ধারণ করবার সৌভাগ্যে ভারতভূমি মহিমান্বিত হয়েছিল। দুশ্চর ও দুষ্কর তপস্যায় নিরত ভারতের আত্মা তোমার পুনরাবির্ভাবের জন্যই পথ চেয়ে থাক্‌বে।'

ভারতের মাটীতে সত্যাগ্রহের বীজ বপন বিফল হবে না। সেই বীজ একদিন অমর অঙ্কুরে অম্বর পানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গানে বল্‌বে ঃ—ভুলি নাই, ভুলি নাই!

'আমরা জানি, আমাদের যুদ্ধ আত্মার যুদ্ধ, সমগ্র মানবতার জন্য। মানুষ তার চারিদিকে যে বন্ধন জাল বুনেছে, তা'থেকে আমরা তাকে মুক্ত করব। আমরা প্রজাপতিকে বোঝাব যে আকাশের অনিবার উদারতা, গুটির নিরাপদ আশ্রয়ের চেয়ে অনেক সুন্দরতর। পরম পুরুষ নারায়ণের সঙ্গেই আমাদের মৈত্রী স্থাপন করতে হবে, এবং আমাদের জয় হবে ভগবানের পৃথিবী জয়। আমরা যদি সমগ্র পৃথিবীকে অমর আত্মার শক্তি দেখিয়ে সবলকে, সমুন্নতকে, সশস্ত্রকে তুচ্ছ করতে পারি, তবে দানব-কামনার বিশাল প্রাসাদ শূন্যে বিলীন হ'য়ে যাবে। তখনই মানুষ লাভ করবে তার সত্যিকারের স্বরাজ।'

সেই আলোকময় প্রভাতের দিকে চোখ রেখে অ্যাটম্-বোমার বিভীষিকাময় অন্ধকারে আর্ত্ত মানুষের আত্মা কেঁদে ওঠে ঃ—কতদিন, ভগবান, আর কতদিন ?

পরিশিষ্ট

মহামানবের মহাপ্রয়াণ

দিল্লীর বুকে সন্ধ্যা নেমে আস্‌ছে। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিগুলো যেন বিরলা-ভবনের ওপর আকুল ক্রন্দনে ঝ'রে পড়ছে। আর সেই রশ্মির অনুসরণ ক'রে দলে-দলে লোক এসে বিরলা-ভবনের সামনে সমবেত হয়েছে। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন: বাপুজীর খবর কি? মহাত্মাজী আততায়ীর গুলিতে আহত হয়েছেন—জনতা তাঁর কুশলসংবাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। তাদের মন আশা আর আশঙ্কার দোলায় দুল্‌ছে।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ একজন বাইরে এসে বল্লেন, 'বাপুজী আর নেই।' বাপুজী আর নেই! জনতা শুন্‌ল সে-কথা, কিন্তু প্রথমটা বুঝ্‌তে পারল' না। ৭৯ বছর বয়সেও যাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তি আমাদের আশার বাণী শোনাচ্ছিল, আমাদের অন্তরে উৎসাহের সঞ্চার করছিল, তিনি আর নেই, এ-কথা এক-মুহূর্ত্তে অনুধাবন করা শক্ত। কিন্তু যখন বুঝল', তখন জনতার মধ্যে চাপা-কান্নার ঢেউ উঠল। সেই কান্না দেখতে-দেখতে ছড়িয়ে পড়ল, দিল্লীর পথে পথে ঘরে-ঘরে। অল-ইণ্ডিয়া-রেডিওর মারফত পণ্ডিত নেহেরুর আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ভারতের আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ল, 'বন্ধুগণ ও সহকর্মীগণ আমাদের জীবনের আলো নিভে গেছে। চারিদিক আজ অন্ধকার। আপনাদের কি-কথা বল্‌ব', কেমন ক'রে বল্‌ব', তা' আমি বুঝতে পারছি না। আমাদের প্রিয় নেতা—আমাদের বাপু আর ইহলোকে নেই। আমরা আজ পিতৃহীন।'

একে একে নেতারা গান্ধীজিকে শেষ-দেখা দেখতে এলেন। পণ্ডিত নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল, লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এবং অন্যান্য সকলে এসে পৌছলেন। গান্ধীজির শয্যার চারপাশে তাঁর আত্মীয় স্বজন ও আশ্রম বাসীরা বসেছিলেন। তাঁরা গান্ধীজির প্রিয়-ভজন 'রঘুপতি রাঘব

রাজারাম' গান করছিলেন। কয়েকজন মুসলমানও এসে উপস্থিত হলেন। একজন বৃদ্ধ আলেম সুর ক'রে উর্দ্দু ভাষায় বল্লেন, 'হে শহীদ, আপনার মহান্-স্মৃতি চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকবে। মানুষের মঙ্গলের জন্যে আপনি প্রাণদান করেছেন, আপনি ধন্য। আপনি বন্ধুহীনের বন্ধু ছিলেন, আপনি অসহায়ের সহায় ছিলেন, আপনি ধন্য।'

ওদিকে বিরলা-ভবনের আশেপাশে তখন লোকে লোকারণ্য। জনতা যাতে দর্শন করতে পাবে, সেই উদ্দেশ্যে গান্ধীজির দেহ প্রথমে বারান্দায়, তারপর তেতলায় ছাতের ওপর রাখা হয়।

ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে বিষণ্ণ রজনী প্রভাত হ'ল। বেলা ১১-৪৫ মিনিট নাগাদ বিরলা ভবন থেকে শব-শোভাযাত্রা আরম্ভ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বেজে উঠল এবং জনতার ব্যাকুল কণ্ঠে মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠল 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়!'

একখানি সামরিক গাড়ী ফুলদিয়ে সাজিয়ে তার ওপর গান্ধীজির দেহ রাখা হয়েছিল। তাঁর পরণে শুভ্র-খদ্দর, কপালে কুঙ্কুম রেখা, গলায় খদ্দরের মালা। তাঁর শয্যা ফুলের মালায় আবৃত। তাঁর স্থির গম্ভীর মুখে একটা অদ্ভুত প্রার্থনা-রত প্রশান্তি। যেন নিমীলিত-নয়নে তিনি প্রার্থনা করছেন, 'ভগবান, তুমি ওকে ক্ষমা করো, ও জানে না ও কি করেছে।'

পণ্ডিত নেহেরু, সর্দ্দার প্যাটেল এবং ভারত-গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য মন্ত্রীরাও শবানুগমন করছিলেন। সস্ত্রীক ও সকন্যা লর্ড মাউণ্টব্যাটেনও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

দিল্লীর পথে এত লোক আগে আর দেখা যায়নি। মনে হয় দিল্লীর সমস্ত অধিবাসীরা শোভাযাত্রার দু'পাশে এসে সমবেত হয়েছে। পুলিশ ও সৈন্যেরা জনতাকে সংযত রাখতে চেষ্টা করছিল। ভিড়ের চাপে

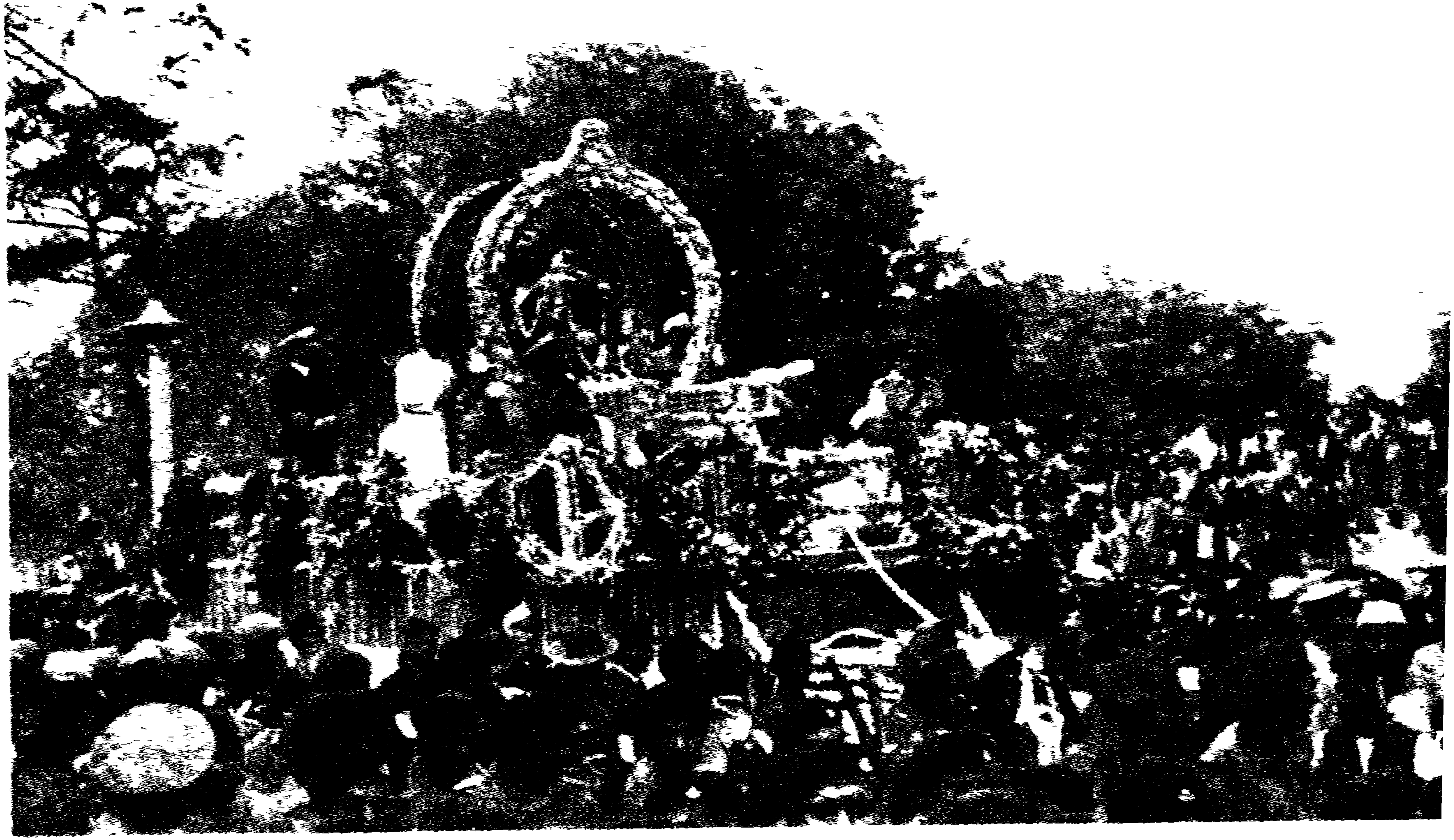

মহাত্মা গান্ধীর ভস্মবহন

আহতদের শুশ্রূষার জন্যে অ্যাম্বুলেন্স্ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পথের দু'পাশে বাড়ী থেকে শবদেহের ওপর ফুল ও ফুলের মালা পড়তে লাগল। আকাশ থেকে এরোপ্লেন পুষ্পবৃষ্টি করছিল।

শোভাযাত্রা যমুনাতীরে রাজঘাটে এসে উপস্থিত হ'ল। তিনফুট উঁচু একটী বেদীর ওপর চন্দন-কাঠের চিতা সজ্জিত হ'ল। জনতা জ্বলন্ত চিতার দিকে চেয়ে রইল। চোখে তাদের অশ্রু, কিন্তু কণ্ঠে উদাত্ত ধ্বনি জাগল—'মহাত্মা গান্ধী অমর হো গয়ে'।

পণ্ডিত নেহেরুও তাই বল্লেন। বল্লেন, 'চিতার আগুন এখনো নেভেনি, নেভবার নয়। যে শিখা গান্ধীজি নিজে হাতে জ্বালিয়েছিলেন, তা' আমাদের অন্তরে জ্বল্‌ছে। জাতির অন্ধকার পথে তারই আলোক-রেখা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

বারোদিন অশৌচের পর ১২ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার গান্ধীজির শ্রাদ্ধ শান্তির আয়োজন করা হ'ল। ঠিক হ'ল সে দিন ভারতের বিভিন্ন স্থানে পুণ্য সলিলে গান্ধীজির পবিত্র অস্থি বিসর্জ্জন দেওয়া হবে। অস্থি-স্পেশাল ভারতের দিকে-দিকে চিতাভস্ম বহন ক'রে নিয়ে গেল। সবচেয়ে বেশী ঘটা হ'ল প্রয়াগতীর্থে অর্থাৎ এলাহাবাদে।

অস্থি-স্পেশাল এলাহাবাদ জংশনে পৌঁছানোর পর প্ল্যাটফর্মে সৈন্যদল গার্ড অফ অনার দিল। ষ্টেসনে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু, সর্দ্দার প্যাটেল প্রভৃতি অন্যান্য মন্ত্রীরা, যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। ভস্মাধারটী নিয়ে ষ্টেশনের বাইরে অনুষ্ঠানের উপযোগী ক'রে সাজানো একটী মিলিটারি ট্রেলারের ওপর রাখা হ'ল। ট্রেলারখানির চারধার ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। শোভাযাত্রা রওনা হবার সময় গান্ধীজির ৭৯ বছরের স্মরণে এলাহাবাদ কেল্লা থেকে দু'মিনিট অন্তর ৭৯টী

তোপধ্বনি করা হ'ল। ৯॥টা নাগাদ শোভাযাত্রা ত্রিবেণী সঙ্গম অভিমুখে রওনা হ'ল। শোভাযাত্রার সামনে রইল চারখানা জিপ্‌গাড়ী, তারপর দু'খানা আরমার্ড গাড়ী। শোভাযাত্রা সহরের নানা পথ ঘুরে যখন ত্রিবেণী রোডে পৌছল, তখন ভস্মাধার-বাহী ট্রেলারখানা ফুলে-ফুলে ছেয়ে গেছে। ঘাটে নৌকা ঠিক করা ছিল। পণ্ডিত নেহেরু স্বয়ং নৌকায় ক'রে গিয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে গান্ধীজির পবিত্র ভস্ম বিসর্জ্জন দিলেন। দর্শকদের ক্রন্দন ও পুরোহিতদের মন্ত্রপাঠের মধ্যে ত্রিবেণীবুকে বুদ্বুদ জেগে উঠ্‌ল।

কলিকাতার অনুষ্ঠান হ'ল ব্যারাকপুরে—গবর্ণমেণ্ট হাউসের সামনে গঙ্গার ঘাটে। বাংলাদেশের গভর্ণর শ্রীরাজাগোপালাচারী ভস্মাধার বহন ক'রে নিয়ে বারো ফুট উচ্চ বেদীর ওপর রাখ্‌লেন। তারপর বিভিন্ন ধর্ম্মের পুরোহিতরা তাঁদের ধর্ম্মগ্রন্থ থেকে মন্ত্রপাঠ করলেন। তারপর মধ্যগঙ্গায় চিতাভস্ম বিসর্জ্জন দেওয়া হ'ল।

এইভাবে ভারতের নানাস্থানে গান্ধীজির শেষকৃত্য সমাপন করা হ'ল।

(খ)

মহাত্মাজীর প্রতি নেতাজী

অনেকের ধারণা মহাত্মাজীর সঙ্গে মতবিরোধের ফলে সুভাষচন্দ্র যে-বিদ্রোহ করেছিলেন, তা'তে মহাত্মাজীর প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছিল। আসলে এ-কথা সত্য নয়। মহাত্মাজীর দু'জনা পুত্রস্থানীয়—পণ্ডিত জহরলাল ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র। জহরলাল পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করেছেন আজীবন বাধ্যতার দ্বারা, আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন বিদ্রোহের দ্বারা। ব্যাঙ্কক থেকে মহাত্মাজীর ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৪৩ সালের ২রা অক্টোবর নেতাজী যে বক্তৃতাটী দিয়েছিলেন, তা'পাঠ করলেই এ-কথা খুব ভালভাবে বোঝা যায়।

"ভারতের সেবায় এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের চেষ্টায় মহাত্মাজির দান এত অসামান্য ও অনুপম যে, তার জন্যে তাঁর নাম আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। এ কথা সকলেই জানেন, শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের জন্যে আমি শুধু পুণরাবৃত্তি করছি। জালিয়ানওয়ালা বাগের শোচনীয় ঘটনার পর ভারতের জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামের

মহাত্মার সহিত নেতাজী

নতুন কোন অস্ত্রের সন্ধানে ফিরছিল। এই দুঃসময়ে গান্ধীজির আবির্ভাব। মনে হ'ল, স্বাধীনতার পথ দেখাবার জন্যে স্বয়ং ভগবান তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের সমস্ত লোক তাঁর সত্যাগ্রহের পতাকাতলে সমবেত হ'ল। তাদের প্রত্যেকের চোখেমুখে আশা আর বিশ্বাসের আলো। দৃঢ় ধারণা হ'ল, ভারতের জয় সুনিশ্চিত।...কুড়ি

বছর ধ'রে সংগ্রামের ফলে তিনি ভারতবাসীকে শেখালেন আত্মপ্রত্যয় আর জাতীয় সম্মানবোধ।...কিন্তু আজ তিনি কারাগারে। সুতরাং তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করতে হবে আমাদেরই—দেশের ভেতর থেকে আর বাইরে থেকে। দেশের বাইরে থেকে তাই পাঠাতে হবে মুক্তিসেনা দল...॥"

এই মুক্তিসেনা গঠনের উদ্দেশ্যেই নেতাজীর বিদ্রোহ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নেতাজীর হিংসা আপাতদৃষ্টিতে বিদ্রোহ মনে হ'লেও আসলে তা গান্ধীজির অহিংসারই পরিপূরক। তাই ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে যখন নেতাজী সিঙ্গাপুরে জাতীয় মুক্তি ফৌজ গঠন ক'রেছিলেন, তখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গান্ধীজিকে উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেন, '**জাতীর জনক তুমি**, তোমার আশীর্ব্বাদই আমাদের প্রচেষ্টাকে সাফল্যের পথে এগিয়ে দেবে।'

(গ)

দেশবিদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলী

রোমাঁরোলাঁ ও মহাত্মাজী

মহাত্মাজী জীবিতকালে রোমাঁরোলাঁ তাঁহার জীবনী লিখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদর্শন করিয়াছেন

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন—"মানুষের উন্নততর ভবিষ্যতের কথা যাঁরা ভাবেন, তাঁরা সকলেই মহাত্মা গান্ধীর শোচনীয় মৃত্যুতে ব্যথিত হবেন। অহিংসা-মন্ত্রের ফলেই তিনি প্রাণ হারিয়েছেন, কারণ দেশময় অশান্তির মধ্যেও তিনি সশস্ত্র দেহরক্ষী সঙ্গে করতে রাজী হনান। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, অহিংসা যার জীবনের মন্ত্র, আত্মরক্ষার জন্যেও তার হিংসার সাহায্য নেওয়া উচিত নয়।...পৃথিবী শুদ্ধ লোক যে মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করে, তার কারণ তারা মনে-মনে জানে বর্তমান দুর্নীতিময় দুর্দিনে তিনিই একমাত্র রাজনীতিক্ষেত্রে মানবতা ও সত্যের প্রচার করেছেন। মহাত্মার এই উন্নততর স্তরে পৌঁছানই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

জর্জ্জ বার্ণার্ডশ—"পৃথিবীতে ভালমানুষ হওয়া সবচেয়ে বিপজ্জনক; গান্ধীজির মৃত্যুই তার প্রমাণ। তিনি যা' সত্য ব'লে মনে করতেন, সে-কথা বল্‌তে বা সে-কাজ করতে কোনদিন ভীত হনান।"

পার্ল বাক—"মানুষের স্বাধীনতার যারা শত্রু তারাই শুধু মহাত্মাজীর মৃত্যুতে আনন্দিত হয়েছে, আর সকলের চোখে অশ্রুর বিরাম নেই"।

লিন-ইউ-টাং—"গান্ধীজি ছিলেন আধুনিক যুগের একমাত্র মহর্ষী। শুধু আত্মার জোরে এতখানি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করা একমাত্র এশিয়াতেই সম্ভব।"

ডাঃ হোম্‌স্ (কমিউনিটি চার্চ্চ, নিউ ইয়র্ক)—"গৌতম বুদ্ধের পর গান্ধীজিই শ্রেষ্ঠ ভারতীয়, এবং যীশু খৃষ্টের পরে শ্রেষ্ঠ মানব।"

ষষ্ঠ জর্জ্জ (ইংলণ্ড)—"রাণী এবং আমি গান্ধীজির মৃত্যু সংবাদে মর্ম্মাহত হয়েছি। এ-ক্ষতি শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর। তাই সমবেদনা আমাদের আন্তরিক।"

প্রধান মন্ত্রী অ্যাট্‌লি—"গান্ধীজির মত একজন মানব প্রেমিকের প্রয়াণে আমরা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত।"

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্—"আমাদের যুগে গান্ধীজির চেয়ে মহত্তর আর কেউ ছিল না। তাঁর মত যারা আত্মার শক্তিতে বিশ্বাসী, তাঁর মৃত্যু তাদের মনে জাগিয়েছে নিরাশা আর নিরুৎসাহ।"

প্রেসিডেণ্ট্ টুম্যান (আমেরিকা)—"গান্ধীজি শুধু ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতা ছিলেন না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাঁর স্থান অনেক

ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ মহাত্মাজীকে মটর গাড়ীতে উঠাইয়া দিতেছেন

উঁচুতে।·· বিশ্ব-শান্তি ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রেরণায় আর একজন মহাত্মা আত্মবলি দিলেন।"

জেনারেল ম্যাক আর্থার—"আধুনিক যুগে মহাত্মা গান্ধীর হত্যার মত জঘন্য ঘটনা আর ঘটেনি। তিনি আজীবন এতবেশী ঝড়-ঝঞ্ঝার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়ী হয়েছেন যে, তাঁকে লোকে অহিংসার প্রতীক হিসেবেই মনে করত। তিনি যে হিংসার হাতে প্রাণ হারাবেন, এর চেয়ে

অভাবনীয় আর কিছু হ'তে পারে না।...মানুষের সভ্যতাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় তবে সকলকেই তাঁর মত বিশ্বাস করতে হবে -মতভেদের মীমাংসা করতে ক্ষমতা প্রয়োগ করা শুধু অন্যায় নয়, আত্মঘাতী।"

জেনারেলিসিমো এবং মাদাম চিয়াং কাইশেক—"গান্ধীজির মৃত্যুসংবাদ আমাদের শোকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। তাঁর মৃত্যু পৃথিবীর পক্ষে একটা মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি।"

পোপ পায়াস্ XII (ইটালী)—"গান্ধীজি শুধু ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন না, তিনি আজীবন বিশ্ব-শান্তির জন্যে চেষ্টা করেছেন।"

রাজা ফারুক (মিশর)- "গান্ধীজির মৃত্যুতে প্রাচ্য হারিয়েছে একজন প্রেমিককে, পৃথিবী হারিয়েছে একজন শ্রেষ্ঠ মানবকে।"

চিলির প্রেসিডেন্ট—"আমার মনে হয়, গান্ধীজিকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেখাবার একমাত্র পথ, সব-রকম হিংসা থেকে বিরত হওয়া।"

(ঘ)

মহামানবের মহাবাণী

১। লোকের ওপর আধিপত্য করবার আমার একমাত্র অস্ত্র প্রেম।

২। আমার লক্ষ্য বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন এবং আমি অপরিসীম প্রেম সত্ত্বেও অন্যায়ের প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে পারি।

৩। প্রেম কখনো দাবী করে না, চিরকাল দান করে। প্রেমের উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা নয়, অসীম তিতিক্ষা।

৪। যেখানে প্রেম, সেখানেই ভগবান।

৫। সমস্ত পৃথিবীকে খুসী করার জন্যে আমি ভগবানের বিরোধিতা করতে পারি না।

৬। মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেই আমি ভগবানকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছি।

৭। পৃথিবী থেকে একজন পাপিষ্ঠকে দূর করবার জন্যে যদি কেউ আমার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে, সে গুলিতে প্রকৃত গান্ধী নিহত হবেন না, আক্রমণকারীর চোখে যা'কে পাপিষ্ঠ বলে মনে হয়েছে, সেই মারা যাবে।

৮। যারা আমার ওপর দোষারোপ করছে, তাদের প্রতি আমি যেন ক্রুদ্ধ না হই এবং তাদের হাতে মৃত্যু হ'লেও যেন তাদের অমঙ্গল চিন্তা না করি, ভগবান যেন আমাকে সেই মানসিক শক্তি দেন।

৯। আমার মত শত-সহস্র লোক মৃত্যু বরণ করুক, কিন্তু সত্য যেন কিছুতে বিনষ্ট না হয়।

১০। আমি জানি, মৃত্যু জীবনের রূপান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। তাই মৃত্যু যখনই আসুক, তাকে আমি সানন্দে অভ্যর্থনা করব'।

---

(৬)

জীবন ও বাণী

গান্ধীজির চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সতর্ক সত্যনিষ্ঠা। তিনি বারবার বলতেন, 'আদর্শকে যদি বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করা হয়, তা' হ'লে আদর্শের যথার্থ রূপ ধারণা করা যায় না। আমার আদর্শের সঙ্গে আমার প্রতিদিনকার আচরণে কতখানি ফাঁকী আছে, সেটা না বুঝলে আমাকে হয় অযথা প্রশংসা না হয় অযথা নিন্দা করা হবে'।

১৩৫৫ সালের বৈশাখের 'শনিবারের চিঠি'তে শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু গান্ধীজির সতর্ক সত্যনিষ্ঠার সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনাগুলো থেকেই বোঝা যায় গান্ধীজির চরিত্র-চিত্রণে বড়-বড়

রাজনৈতিক কীর্তির তুলনায় এই সব ছোট-ছোট ঘটনার দাম নেহাৎ কম নয়।

(১) একবার গান্ধীজি ট্রেনে চলেছেন। আহারের সময় গ সেদিন আঙুর খেলেন। তাই দেখে একজন সহযাত্রী সমালোচনার ভাষায় বল্লেন, 'তুমি শুনিছিলুম দিনে ছ'পয়সার মত খাও? গরীবদের সঙ্গে সমান ভাবে চলো?' ঐ আঙুর খাওয়াটা কি তার নমুনা?'

গান্ধীজি লজ্জিত হ'য়ে বল্লেন, 'আপনি দেখে ফেলেছেন, ভালই হয়েছে। আমি চাই, আপনি আমার এই ত্রুটিটুকু লোকের কাছে প্রকাশ ক'রে দিন, লোকে আমার সত্য পরিচয় জানুক।'

(২) আর একবার নোয়াখালি-সফরের সময়। তখন বিহারের দাঙ্গাও থেমে গেছে। গান্ধীজি তখন শ্রীরামপুর গ্রামে। একদিন পরশুরাম নামে একজন তামিল কর্মী গান্ধীজিকে বল্লেন, 'আপনার এখন উচিত বিহারে যাওয়া। বিহারে হিন্দুরা যদি মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করে, তা'হলে আপনি কোন মুখে নোয়াখালির মুসলমানদের কাছ থেকে সুব্যবহার আশা করেন?'

গান্ধীজি উত্তর দিলেন, 'বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রীরা আমার শিষ্য। আমি এখান থেকে উপদেশ পাঠিয়ে তাঁদের দিয়ে বিহারে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু বাংলায় ত আর তা' সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে আমার থাকা দরকার।'

কিন্তু পরশুরাম তা' মানতে রাজী নন্। গান্ধীজি একঘণ্টা ধ'রে তর্ক ক'রেও কিছুতে পরশুরামকে এ কথা বোঝাতে পারলেন না। পরশুরাম চ'লে গেলে নির্মলবাবু গান্ধীজিকে বল্লেন, 'আপনি আজ এ ভাবে সময় নষ্ট করলেন কেন? পরশুরামকে বারণ ক'রে দিলেই ত হাঙ্গাম চুকে যেত।'

গান্ধীজি ধীরভাবে উত্তর দিলেন, 'না, সময় নষ্ট হয়নি। পরশুরাম সৎলোক, তার বুদ্ধিও সাধারণের চেয়ে কম নয়। তাকেই যখন আমার বক্তব্য বোঝাতে পারলুম না, তখন নিশ্চয়ই আমার যুক্তিতে কিছু ভুল আছে। তা' নইলে একবার শুনেই ত পরশুরাম আমার মতে সায় দিত। আমার আলোচনার উদ্দেশ্য আমার যুক্তির ভুল শুধরে নেওয়া।'

(৩) তৃতীয় ঘটনাটা ঘটেছিল কলিকাতায়। ১৯৪৭ সালের ৩১ শে আগষ্ট কলিকাতায় আবার হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা সুরু হয়। গান্ধীজি প্রথমটা জনতাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বিফল হ'য়ে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক করলেন, দাঙ্গা না থামা পর্য্যন্ত অনশন করবেন। তিনি মনস্থির করবার পর বাংলা দেশের গভর্ণর শ্রীরাজাগোপালচারি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কাগজে ছাপবার জন্যে গান্ধীজি যে-বিবৃতি লিখেছিলেন, সেটা রাজাজিকে পড়্‌তে দিলেন। তা'তে এক যায়গায় ছিল, 'আমি যখন অনশনের মধ্যে জল খাব, তখন জল নুন সোডি বাইকার্ব্ এবং লেবুর রস মিশিয়ে নোব।'

রাজাজি এই অংশটা প'ড়ে বল্লেন, 'যদি আমরণ-অনশন করবারই আপনার ইচ্ছে, তবে জলে নুন আর সোডা দেওয়ার মানে বুঝি, কিন্তু লেবুর রসের কারণ ত বুঝ্‌লুম না।'

গান্ধীজি তক্ষুনি 'এবং লেবুর রস' কথাটা কেটে দিলেন এবং লজ্জিত হ'য়ে বল্লেন, 'সত্যিই আমার ভয়ানক অন্যায় হ'যে গেছে। বোধ হয়, আমার বেঁচে থাকবার ইচ্ছে এতো বেশী যে, অসাবধানে আমি ও কথাটা লেখে ফেলেছিলুম।'

মহাদেব দেশাই ও মহাত্মাজী

—শেষ—